অক্ষয়কুমার সরকার

জনক ও গুরুর

রূপক ও রহস্য

হৃষীকেশ-সিরিজ, নং—৬

রূপক ও রহস্য

কলিকাতা,
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩৩০

মূল্য দুই টাকা
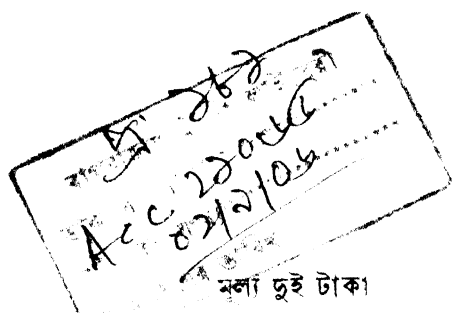
কলিকাতা,
কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রীনারসিংহ প্রেসে,
তচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৩০

সূচি

রচনার বিষয় — পৃষ্ঠা

"—তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ।"

গ্রন্থ-পরিচয়

পরমারাধ্য পিতৃদেবের এই গ্রন্থ-পরিচয় লিখিতে বসিয়া আজ এক নূতন শোকে, নূতন দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি,—চোখে জল রাখিতে পারিতেছি না। দুঃখ এই যে, যিনি স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, মহা আগ্রহে, নিজের অন্যতম কর্ত্তব্যজ্ঞানে এই পুস্তক সম্পাদন করিবার ভার লইয়াছিলেন, আজ তিনিও অমর ধামে। এই দুঃখ বুকের ভিতর শেলের মত বিঁধিতেছে।

আমি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি পিতৃদেবের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, এ কথা সাহিত্যসেবি-মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু এমন মধুর গুরুশিষ্য-সম্পর্ক আজকালকার দিনে একেবারে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামেন্দ্র-সুন্দর বাবাকে প্রকৃত সাহিত্য-গুরু-জ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, বাবাও তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন,—অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। আমার জ্ঞানভোর আমি তাঁহাদের এই মধুর সম্বন্ধ দেখিয়া আসিয়াছি।

কাশিমবাজারে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় প্রবন্ধে [illegible]ছিলেন,—"তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই সাহিত্য-[illegible]ন উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। আমরা সাহি[illegible]লনে সমবেত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন

প্রার্থনা করিতেছি।" আর পিতৃদেব চুঁচুড়া-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশে তাঁহার অভিভাষণে লিখিয়াছিলেন,—"রামেন্দ্রসুন্দর এক সময়ে আমার সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন; কিন্তু 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে,'—তিনি জ্ঞানবলে গরীয়ান্, সুতরাং আমার গুরু।" পিতৃদেব সভামধ্যে যেমন এই অংশ পাঠ করিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর অল্প দূরে বসিয়াছিলেন, তাঁহার অমন সৌম্য, প্রশান্ত মুখখানি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল,—তিনি তৎক্ষণাৎ কর যোড়ে পিতার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বসিলেন। এই দৃশ্য এখনও আমার চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে,—আর আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এমন মধুর গুরুশিষ্য-সম্পর্ক আর কখন দেখি নাই।

পিতৃদেবের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই ত্রিবেদী মহাশয় আমাকে ডাকাইয়া পাঠান এবং বাবার সমস্ত লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য আমাকে বলেন। এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। মনে মনে নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল যে, আমি পুত্র—পিতার রচনাগুলি প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার যতটা না আগ্রহ, ইঁহার আগ্রহ দেখিতেছি তাহার সহস্রগুণ! সেই দিনই ত্রিবেদী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, বাবার ইচ্ছা ছিল যে, রূপক ও রহস্য শ্রেণীর তাঁহার যতগুলি রচনা আছে, সেইগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা। তাঁহাকে আরও বলিলাম, আমি সেইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধ নকল করিয়াছি। অনেকগুলি প্রবন্ধের স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা দে[illegible] কার; কারণ প্রবন্ধগুলি বহুদিন আগের রচনা, আর অনেকগুলিই [illegible]য়িক প্রবন্ধ,—আবশ্যকমত

টীকা না দিলে এখনকার দিনে বুঝিতে কষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন,—
"তুমি আমাকে সবগুলি এনে দাও, যাতে ভাল হয়—আমি তারই
ব্যবস্থা কর্‌ব।"

আমি অবিলম্বে এই আদেশ পালন করিয়াছিলাম, কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের এত সাধের বই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইল না। ক্রমাগত শোকের ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তিনি মনভাঙ্গা হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। মৃত্যুর করাল ছায়া যখন তাঁহার সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমাকে দেখিয়াই তিনি হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—"অজয়, আমি ভাল হ'য়ে উঠেই বাবার বইখানিতে হাত দিব; তোমার কোন ভয় নেই। এইবার সেরে উঠ্‌লেই আগে ঐ কাজটা আরম্ভ কর্‌ব।" কিন্তু কৈ, মানুষ যাহা ভাবে, সকল সময়ে তাহা করিয়া উঠিতে পারে কৈ? রামেন্দ্রসুন্দরের আর এক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল!

রামেন্দ্রসুন্দরের অবর্ত্তমানে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইলে ভালই হইত—ইহা বুঝিয়াও কিন্তু বুঝিলাম না। মনে হইল, না—তাঁহার দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদিত হওয়া যখন ভগবানের অভিপ্রায় নহে, অথচ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে তাঁহার প্রবল বাসনা ছিল, তখন অন্য কাহাকেও এই কাজের ভার লইতে অনুরোধ করা ভাল দেখায় না। তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ-পূর্ব্বক যতদূর সম্ভব সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া নিজেই এই বই প্রকাশ করিব।

কিন্তু পিতার লিখিত প্রবন্ধনিচয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা পুত্রের পক্ষে মহা বিড়ম্বনা—এ কথা আগে বুঝিতে পারি নাই। লেখার গুণ বর্ণনা করিবার, সুখ্যাতি করিবার উপায় নাই—লোকে বলিবে,

"বেটা সার্টিফিকেট দিচ্ছে বাবাকে,—স্পর্দ্ধা দেখ!" আবার কোন দোষের কথা উল্লেখ করিলেই পাঁচজনে বলিবে,—"বেটা সমালোচনা করছে বাপের লেখার,—ঘোর কলি!" সুতরাং আমার উভয় সঙ্কট! তাই স্থির করিয়াছি, গ্রন্থের লিখিত বিষয়ের দোষগুণ-সম্বন্ধে বোবা সাজিব এবং শত্রুর সংখ্যা আর বাড়াইব না। তবু কিন্তু ভয়ে ভয়ে একটি কথা বলিতেছি। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এবং সকল প্রকার রচনায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা ছাড়িয়া দিলে, বলিতে হয় যে, এ ধরণের লেখা এখন আর একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না,—পূর্ব্বেও যে বেশী যাইত, তাহাও নহে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও কলম হইতে এই শ্রেণীর এতগুলি লেখা কখনও বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির লেখাও ঠিক এই ধরণের বলা যায় না।

১২৫৩ সালের ২রা অগ্রহায়ণ পিতৃদেব আমাদের কদমতলার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৪ সালের ১৬ই আশ্বিন, ৭১ বৎসর বয়সে, সেই বাড়ীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমস্ত জীবন মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম বাইশ বৎসর পাঠ্যাবস্থা, দ্বিতীয় একুশ বৎসর (অর্থাৎ ১২৭৫ হইতে ১২৯৬) সাহিত্যময় জীবন এবং তৃতীয় আটাশ বৎসর সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে তাহা,—"যমে মানুষে টানাটানির পালা,—কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি।"

দ্বিতীয় একুশ বৎসরের মধ্যে প্রথম চারি বৎসর মাত্র পিতৃদেব বহরমপুরে ওকালতি করিয়াছিলেন। বহরমপুরে থাকিতেই, ১২৭৯

সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় তাঁহার লিখিত "উদ্দীপনা" প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোটখাট' রচনা ছাড়িয়া দিলে, ইহাই বাবার প্রথম প্রবন্ধ। তাহার পর ১২৮০ সাল হইতে সাধারণী ও ১২৯১ সাল হইতে নবজীবন প্রকাশিত হইয়াছিল; ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে সাধারণীর সহিত নব-বিভাকর পত্রিকা মিলিত হইয়া যায় এবং ১২৯৬ সালে নববিভাকর-সাধারণী ও "নবজীবন" বন্ধ হইয়া যায়। এই সতের বৎসর পিতা সমানে, একটানে, অবাধে সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন; এই সতের বৎসরের মধ্যে এক দিনের তরেও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না, অবসর ছিল না, অবকাশ ছিল না।

এই সময়ের মধ্যেই ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহযোগিতায় পিতার সম্পাদিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রণীত গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, শিক্ষানবিশের পদ্য ও হাতে হাতে ফল এই সময়ে বাহির হইয়াছিল।

১২৯৫ সালে পিতামহ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় যোগ্য ধামে গমন করিলেন,—বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। পিতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতা পিতামহের একমাত্র সন্তান। ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান শোক। এই শোকের ধাক্কা তিনি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তাঁহার একটানা, খরস্রোত সাহিত্য-সেবায় বাধা পড়িল; মনের বল কমিয়া গেল, কলমের জোর কমিয়া গেল—একনিষ্ঠ সাধকের সাহিত্য-সাধনায় বিঘ্ন ঘটিল।

পরের আটাশ বৎসরের মধ্যে তবে কি পিতৃদেব সাহিত্যসেবা একেবারে করেন নাই? কে বলিল? কিন্তু আগের মত অনন্যকর্ম্মা হইয়া একমনে একধ্যানে বাণীর সেবা করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার হয় নাই।

১২৯৭ সালে আমাদের ছোট ছোট সাতটি ভাইবোনকে রাখিয়া মা মারা গেলেন,—বাবা আমাদের লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমাদের সংসারে এমন কোন আত্মীয়া ছিলেন না যে, পাঁচ মাসের ছোট ভাইটিকে দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করেন। বাবাকে বাধ্য হইয়া একজন সৎজাতীয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাকে পালন করাইতে হইল। তাহার পর ঠাকুরমার মৃত্যু, বড়দাদার মৃত্যু, মেজদিদির মৃত্যু, বড়, মেজ ও সেজ ভগিনীপতির মৃত্যু—আর কত মৃত্যুর উল্লেখ করিব? এমনি করিয়া বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে, আর বাবার বুকের এক একখানি পাঁজরা খসিয়া গিয়াছে। এততেও কিন্তু তিনি সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্য-সেবা করিতে বিরত হন নাই।

এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার **পিতাপুত্র**, **সনাতনী** ও **কবি হেমচন্দ্র** প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সময়ে তিনি **বঙ্গবাসী** ও **পূর্ণিমার** নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে লিখিতেন; এই সময়ে তিনি সাহিত্য-সম্মিলনের তিনটি অধিবেশনে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তাছাড়া **হিন্দুসমিতির** ছেলেদের লইয়া তিনি সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার শেষ লেখা মৃত্যুর ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের মধ্যে যে ছত্রিশটি রচনা মুদ্রিত হইল, তাহার সকল

গুলিই ১২৭৯ হইতে ১২৯৭ সালের লেখা; অর্থাৎ পিতৃদেবের জীবনের মধ্যভাগের রচনা—প্রায় ৩২ হইতে ৫০ বৎসর আগের রচনা। সকল লেখাই রূপক ও রহস্য শ্রেণীর, সেই জন্য পুস্তকের নাম "রূপক ও রহস্য" দেওয়া হইয়াছে। বাবার গম্ভীর ভাবের একটিও প্রবন্ধ—যেমন 'দশমহাবিদ্যা,' 'উদ্দীপনা', 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম' প্রভৃতি এই পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই। এই সকল প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এইরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সাবশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য-লেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ইচ্ছা আছে, এই সকল প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব। কিন্তু 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।'

এইরূপ আর দুই পাঁচটি রস-রচনা পিতার মৃত্যুর পর "মোতিকুমারী" নামে পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেগুলি এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না; যদি কখনও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবেই সেগুলি তাহাতে যোজনা করিয়া দিব, কিন্তু সে আশা একান্তই দুরাশা বলিয়া মনে হয়। কেন? পরে বলিতেছি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, অনেক দিনের আগের লেখা বলিয়া এবং অধিকাংশই সময়োপযোগী রচনা বলিয়া রচনার মধ্যে অনেক স্থলে টীকার আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। লেখকের নিজের টীকাগুলি বড় (স্মল পাইকা) এবং আমাদের দেওয়া টীকাসকল ছোট (বর্জাইস) অক্ষরে

পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বহুভাষাবিৎ, সুকবি ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সকল টীকা লিখিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশ সাহায্য না পাইলে গ্রন্থের অনেক স্থলের মানে বুঝিতে পারাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। তিনি জরাজীর্ণ, দৃষ্টিশক্তিহীন, নিজের শত কর্তব্যে সারা দিন বিজড়িত, তবুও তিনি এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন—এই কথা মনে হইতেই আমার মাথা তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে.—তাঁহাকে মামুলি ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না।

রচনাগুলি যখন পুস্তক-মধ্যে মুদ্রিত হইতেছিল, তখনও দুই চারিটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে পারি নাই। যেমন—৫৪ পৃষ্ঠার শেষে মুদ্রিত হইয়াছে,—

"চিকুর কানড় ছাঁদে মুড়ি।"

'কানড়'—একপ্রকার কেশ-বিন্যাস। কানড় সাপ যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, সেই ভাবে সেকালের স্ত্রীলোকেরা একরূপ কেশ-বিন্যাস করিতেন। গোবিন্দ দাসে আছে,—"ধনী কানড় ছাঁদে বাঁধে কবরী।"

৮২ পৃষ্ঠার শেষে—

"একবর্গ সমুদ্ভূতশ্চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদঃ।
অনুলোম-বিলোমেন স দেবঃ পাতু বঃ সদা॥"

—এই সংস্কৃত প্রহেলিকা মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রণ-সময়েও ইহার উত্তর ঠিক করিতে পারি নাই।—একবর্গ (পাঁচটি করিয়া বর্ণ লইয়া যে বর্গ, সেইরূপ একটি বর্গ) হইতে উদ্ভূত এবং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ-দাতা) সেই দেবতা অনুলোম ও বিলোমের দ্বারা

(অর্থাৎ সোজা ও উল্টা দিক্ হইতে পড়িলে যাহা হয়, সেই দুই রূপেই) তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই প্রহেলিকার উত্তর—নন্দনন্দন।

১১২ পৃষ্ঠার মাঝখানে মুদ্রিত হইয়াছে,—

"দক্ষিণ কড়চে আগে প্রণামীটি লবে,
'আসিতে হউক আজ্ঞা'—তারপর কবে ;"

মুদ্রণ-সময়ে কড়চের অর্থ বুঝিয়াছিলাম 'হাত', কিন্তু মনে একটা খটকা থাকিয়া গিয়াছিল। নানা অভিধান উল্টাইয়া ছিলাম—শব্দটি পাই নাই। এখন কিন্তু কড়চের যথার্থ অর্থ শিখিয়াছি। কড়চ মানে—ট্যাঁক। কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ট্যাঁক বলে না, কড়চ বলে। আগে ডান ট্যাঁকে প্রণামীটি গুঁজিবে, তারপর 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া আহ্বান করিবে—উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে।

বাবা প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন,—"আমার জীবন একটা মহা বিড়ম্বনা ! আমি শিক্ষা পাইয়াছি এক সমাজে, আর আমাকে পরীক্ষা দিতে হইতেছে অন্য সমাজে।" বাস্তবিকই কাহারও শিক্ষা-দীক্ষার কথা, চিন্তার ধারার কথা বুঝিতে হইলে, তিনি যে সমাজে মানুষ হইয়াছিলেন, সেই সমাজের অবস্থা বুঝা একান্ত আবশ্যক। কেন না, 'সমাজ মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে গুরুগিরি করিয়া থাকে।'

পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে আমাদের বঙ্গ-সমাজের যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন আর কোন বিষয়ে হয় নাই। পিতৃদেব লিখিয়াছেন,—"তখন বঙ্গ-সমাজের মূলে ছিল সন্তোষ, এখন এই সমাজের মূলে দাঁড়াইয়াছে অসন্তোষ—একেবারে চিতেন-মোহাড়া উল্টাইয়া গিয়াছে। * * * আমরা সেই সন্তোষের সমাজে, সেই সুখের সমাজে, সেই আনন্দের

সমাজে সন্তোষেই গড়াপিটা হইয়াছিলাম। তখন সেই সন্তোষ থাকাতে সমাজে কতই না স্ফূর্ত্তি ছিল; কতই উৎসাহ, গান-বাজনা, খেলা-ধূলা, কুস্তি-কর্ৎপ কতই না ছিল; কাজেই আমরা বুঝিয়াছিলাম, সুখই জগতের নিয়ম—দুঃখ ব্যভিচার মাত্র। সুখের চোখে সকলই সুন্দর দেখায়। অতি বাল্য কালে ঘোর ঝঞ্ঝার সহিত বজ্র-স্ফোট হইলে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিত, কিন্তু সেই বুকের ভিতর তবু একরূপ আনন্দ উপভোগ করিতাম।”

তখনকার বঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“তখনকার দিনে মজ্‌লিস বলিয়া একটি পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই। পূর্ব্বকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল, আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলা মেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজ্‌লিস তখনকার দিনের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজ্‌লিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। * * * চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসি গল্প জমাইয়া তোলা, একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। * * * এখনকার বড় মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু তাহা নির্ম্মম, তাহা নির্ব্বিকারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। * * * আমাদের মুস্কিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙ্গিয়াছে, সাহেবী

সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোন উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য, দেশ হিতের জন্য দশ জনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশ জনের জন্যই দশ জনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভাল লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড় সামাজিক কৃপণতার মত কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হাল্কা করিয়া রাখিয়াছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর কোন দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

এই সকল কথা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এবং পিতামহের চরিত্রের প্রভাব পিতার চরিত্রে কিরূপ ভাবে ফুটিয়া ছিল—তিনি তাঁহার পিতার চরিত্রের গুণাবলি কি পরিমাণে নিজ চরিত্রে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে তবে বুঝাযায় যে, কি কারণে—কি গুণে পিতৃদেব রস-রচনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

পিতামহ খুব রাশভারি লোক ছিলেন বটে, কিন্তু অমন রসিক পুরুষ, অমন মজলিসি লোক তাঁহাদের যুগেও কম মিলিত। তিনি অতি সামান্য কথাতেও রসের অবতারণা করিতে পারিতেন, প্রাণ খুলিয়া অট্টহাস্য করিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, পিতাকে সুশিক্ষিত করা। তিনি পিতাকে অতি বাল্য কাল হইতেই নিজের নিয়ত সহচর করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার বাল্যজীবন-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"পিতার বিচার-আচার, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা-পরীক্ষা প্রভৃতি শত কার্য্য থাকিলেও আমাকে শিক্ষাদান, তাঁহার

—সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কাছারির সময় ছয় ঘণ্টা ছাড়া. বাকি আঠার ঘণ্টা আমি নিয়তই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। একত্র স্নান করিতাম, একত্র আহার করিতাম, একত্র শয়ন করিতাম, তাঁহার সেই সন্ধ্যাকালের সরগরম মজ্‌লিসের আমি বিনীত অথচ নিয়ত শিশু-সভ্য ছিলাম। * * * এইরূপ হাস্যে ও গাম্ভীর্য্যে আমার শিক্ষালাভ। বালককালে কর্ত্তব্যের কঠোরতায় বা শিক্ষকের তাড়নার ভয়ে দায়গ্রস্ত হইয়া আমাকে শিক্ষালাভ করিতে হয় নাই।"

তাঁহারা পিতাপুত্রে সমানে সমকক্ষভাবে তর্কবিতর্ক করিতেন— শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম আলোচনা করিতেন, সমাজের ভালমন্দ দুইদিক্ বিচার করিতেন, দর্শনের জটিল তত্ত্ব-সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেন, আর উভয়ে বিশুদ্ধ রসভাষে প্রীতি লাভ করিতেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিত, আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত।

পিতৃদেব লিখিয়াছেন,—"পিতার নিকট শুনিতাম,—গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র-তারা—সকলেই মহা সুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও নিয়োজিত;—আকাশের সৌন্দর্য্য বুঝিতাম, শৃঙ্খলা মানিয়া লইতাম। পিতা দেখাইতেন, দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেক গুণে বেশী। কথাটি বেশ করিয়া আপনার ভূয়োদর্শনে মিলাইয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম।—বুঝিয়াছিলাম, জগৎ সুন্দর— সুশৃঙ্খল; পরে বুঝিলাম, ভগবান্ মঙ্গলময়। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই বীজ বাবার পরিণত বয়সে তাঁহার হৃদয়ে মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ভগবান্‌কে শুধু মঙ্গলময় ভাবিতেন না—তিনি অন্তরের অন্তস্থলে ভগবান্‌কে রসময় জ্ঞান করিতেন। এই জগৎ শয়তানের রাজ্য নহে—ইহা রসময়ের রসবিকাশ, লীলাময়ের

লীলাক্ষেত্র—এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, তাই এত আধিব্যাধি, এত রোগশোক, এত দুঃখকষ্টও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

তখনকার সন্তোষের সমাজে মানুষ হইয়া এবং পিতামহের নিরত সাহচর্যাগুণে তাঁহার গম্ভীর ও রসমাধুর্য্যময় চরিত্রের ছাঁচে নিজের চরিত্র গঠন করিয়া, পিতা যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি পাঁচজনের মধ্যে একজন,—তখন তিনি বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানগরিমায় গরীয়ান্, চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তিবলে বলবান্; তখন তাঁহার হৃদয়ের উৎকর্ষ-জনিত প্রশস্ত ও প্রশান্ত বুকের ভিতর রস জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই শুভক্ষণে বঙ্গে **বঙ্গদর্শনের** আবির্ভাব। **বঙ্কিম-চন্দ্র** অনাবিল, বিশুদ্ধ রসের স্রোতে বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্যে বান ডাকাইলেন। বাবা সেই স্রোতে রসের তরী ভাসাইয়া দিলেন। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে **কমলাকান্তের দপ্তর** বাহির হইতে লাগিল, বাঙ্গালি নূতন ধরণের লেখার পরিচয় পাইয়া, অভিনব রসের আস্বাদ পাইয়া আনন্দে বিভোর হইল। তাহার পর পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে বঙ্গদর্শনে লিখিতে লাগিলেন, প্রতি মাসে নিয়মিত-ভাবে প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলেন, মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল! মূর্ত্তিমান্ রসের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পিতার রসময় হৃদয় উথলিয়া উঠিল; সেই রস সাহিত্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কমলাকান্তের দপ্তরের ষষ্ঠ সংখ্যায় বাবার লিখিত **চন্দ্রালোকে** এবং চতুর্দ্দশ সংখ্যায় **মশক** প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে চন্দ্রালোকে প্রবন্ধটি তাঁহার দপ্তরভুক্ত করিয়াছেন এবং মশক

ইতিপূর্ব্বে মোতিকুমারীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাই ঐ দুইটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এইবার গ্রন্থের লিখিত রচনা-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রস-রচনা বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতে ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। এখনকার দিনে পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত; কিন্তু ভগবান্ বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি নিতান্ত বিমুখ! বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রোগে শোকে জর্জ্জরিত, তাই অকালে তাঁহার রসের ফোয়ারা শুকাইয়া গেল। আমাদের দুর্ভাগ্য!

দেশে প্রাণ নাই, আবেগ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই,—কাজেই দেশের সাহিত্যও নীরস, শুষ্ক, প্রাণহীন হইয়া উঠিতেছে। এখনকার শিক্ষিত সমাজ রসগ্রাহী নহেন, রস বুঝিতে পারেন না, বরং সময়ে সময়ে উল্টা বুঝিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া থাকেন। তাই বড় ভয় হয় পাছে, বাবার এই সকল পুরাতন লেখা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ভুল বুঝিয়া বসেন। তাঁহার কোন লেখাই ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই, আর রস-রচনা হইলেও কোথাও শ্লীলতার হানি হয় নাই।

পিতা বঙ্গ-সমাজকে তথা বাঙ্গালিকে যে চোখে দেখিয়াছিলেন এবং যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহারই ভালমন্দ দুই দিক্ এই সকল রচনা-মধ্যে, পদ্যে এবং গদ্যে, অবিকল আঁকিয়াছেন,—ভাষার আড়ম্বর নাই, অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি নাই। তিনি স্বচ্ছ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায়, স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে, সমানে সতেজে কলম চালাইয়া গিয়াছেন,—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন দিকে কর্ণপাত নাই,—তিনি কাহারও

মুখের দিকে তাকান নাই—আপন মনে, প্রাণের আবেগে, প্রাণের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে সকলের যে মতের মিল হইবে, এমন কোন কথা নাই, অমিল হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার লেখা ভুল বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করা না হয়, পাঠকগণের নিকট এইমাত্র অনুরোধ।

দুই একটা উদাহরণ দিলে আমার ভয়টা সকলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

নবজীবনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় পূজনীয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক রহস্যাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; পঞ্চম সংখ্যায় তাঁহার লিখিত চির-নূতন, চির-উজ্জ্বল, স্ফটিকোপম রচনা "রাজ-পথের কথা" বাহির হয়; সপ্তম সংখ্যায় পিতৃদেবের "ভাই হাততালি" মুদ্রিত হইল,—আর রবীন্দ্রনাথ নবজীবনে লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর। সেই সময় হইতে নবজীবনের জন্য তিনি আর কলম ধরেন নাই। ভাই হাততালির প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথের নবজীবনে লেখা বন্ধ হওয়া— উভয়ের মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি অযথা অভিমানভরে লেখা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে, না—ওটা কাকতালীয় ন্যায়।

এই ভাই হাততালি প্রবন্ধেই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের উপর যথেষ্ট অভিমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার উপর বেশ একটু অভিযোগ আছে, কিন্তু সকল উক্তিই লেখকের অভিমান-সম্ভূত, কেবল কপালে করাঘাত, আর সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার। ভাই হাততালি পড়িয়া যদি কেহ মনে করেন যে, পিতৃদেব কেশবচন্দ্রকে ঘৃণা করিতেন, অবজ্ঞা

করিবেন, তাঁহার প্রতি পিতার শ্রদ্ধা ছিল না, তবে তিনি মহা ভুল করিবেন। বাস্তবিকই পিতৃদেব কেশবচন্দ্রকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন. আর সেই জন্যই ভাই হাততালির ছলনায় তাঁহার ঐ মর্ম্মন্তুদ আক্ষেপোক্তি! কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে পিতা সাধারণীতে লিখিয়াছিলেন,—

"ইদানী বহুকাল হইতে আমাদের দেশ এ হেন মহাত্মা লোকের সমাগমে সুপবিত্র হয় নাই। কেশবচন্দ্রের ন্যায় শ্রীচৈতন্যও একজন ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন,—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে দেশ মাতাইতে পারিতেন এবং ভিতরে ভিতরে সমাজ-সংস্করণে মনোনিবেশ করিতেন। শ্রীচৈতন্যের নাম, শ্রীচৈতন্যের গুণগ্রাম নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন ও শ্রীহট্ট হইতে জগন্নাথ পর্য্যন্ত সুপরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের নাম সমস্ত ভারতভূমি ব্যাপিয়া সুপরিচিত।" পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব কি যে, "বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম" পিতৃদেবেরই লিখিত এবং তিনি একজন 'বাঙ্গালি বৈষ্ণব' ছিলেন—শ্রীচৈতন্য দেবকে ভগবানের ভক্তাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন?

তুলনায় সমালোচনের রস রায়সাহেব **হারাণচন্দ্র রক্ষিত** মহাশয় হজম করিতে পারেন নাই; তাই ইহার অযথা সমালোচনা এবং পিতৃদেবের প্রতি কটূক্তি তিনি তাঁহার পুস্তক-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের উপর এই প্রবন্ধের পুনরালোচনার ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম।

তাই বলিতেছিলাম, এইরূপ ভুলভ্রান্তি যখন তখনকার দিনেই হইত, এখন ত ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আরও অধিক।

বাবার কোন কোন লেখা লোকে আর এক ভাবে ভুল বুঝিত।

সাধারণীতে "বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইল যে, চুঁচুড়ার বারিকে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" অভিনীত হইবে। শুনিয়াছি, অনেকে মনে করিয়াছিল সত্যই অভিনয় হইবে,—তাই থিয়েটারের টিকিট কিনিবার জন্য সাধারণীর কার্য্যালয় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; শেষে সম্পাদক মহাশয়কে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতে হয় যে, ঐ বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও রহস্যমূলক! ঠিক এই জাতীয় আর একটি বিষম ভ্রম ১৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

চণকচূর্ণ সম্বন্ধে পিতা "পিতাপুত্রে" লিখিয়াছেন,—"সাধারণীতে চেণাচুর নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম। 'সাধারণীর চেণাচুর' একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদ-পত্রে সাধারণীর চেণাচুরের উল্লেখ থাকিত। 'কিষণ দাসকি চেণা, তেরা রূপেয়া চার আনা,—বড়ালোক লেতেহেঁ, বড়া-লোক খাতেহেঁ'—ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেণাচুর ছেলেরাই খায়,—সাধারণীর চেণাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন।"

এই চণকচূর্ণের মধ্যে "চুঁচুড়ার সং" বর্ণনা করিতে গিয়া পিতৃদেব লিখিয়াছেন,—"আজ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর হইল চুঁচুড়ার সং উঠিয়া গিয়াছে। এবার বহুকষ্টে সেই সং পুনরারম্ভ করা হইয়াছে, তেমন হয় নাই, কিন্তু নিতান্ত মন্দও নহে।" এই অংশ পাঠ করিয়া আধুনিক কোন ঐতিহাসিক যেন বুঝিয়া না বসেন যে, প্রকৃতই পঞ্চাশ বৎসর পরে, ১২৮০ সালের চৈত্র মাসে, আবার চুঁচুড়ার সং হইয়াছিল। চুঁচুড়ার সংএ যেরূপ সামাজিক নানাবিধ ঘটনার হুবহু নক্সা বাহির হইত, (এখন যেমন কলিকাতার জেলে পাড়ার সংএ ইহার সংক্ষিপ্ত

সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়) সেইরূপ আদালতের নিখুঁত ফটো এই প্রবন্ধে তোলা হইয়াছে মাত্র। আমরা শুনিয়াছি, চুঁচুড়ার সংএ প্রতি বৎসর প্রায় ১০।২০ হাজার টাকা খরচ হইত।

নবজীবনের দ্বিতীয় ভাগে জ্যৈষ্ঠ মাসে "জন্তুধর্ম্মী মানব" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আষাঢ় মাসে ৺চন্দ্রনাথ বসু-লিখিত ইহার পাণ্টা জবাব "দেবধর্ম্মী মানব" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পরে তাঁহার পুস্তক-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা পাঠককে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলি।

আমার নিবেদন, সকল প্রবন্ধগুলিই রূপক ও রহস্য মনে করিয়া পাঠ করিলে লেখার ভাব বুঝিতে কষ্ট হইবে না, আর সঙ্গে সঙ্গে ভুল অর্থগ্রহ করিয়া লেখকের প্রতি অবিচার করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না। পিতা পুস্তকের মধ্যে একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে॥"

—এইটুকু স্মরণ রাখিয়া "রূপক ও রহস্য" পাঠ করিবার জন্য পাঠকের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

এক দিন প্রসঙ্গক্রমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আর রস-রচনা লেখেন না কেন? উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—

" 'তারাবাই' নামে একখানি নাটকের নায়িকা নায়ককে বলিয়াছিলেন,—

'গুলঙ্কর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি।'—ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শনে ঐ নাটকের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলাম,—'এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্ কালে দেখি নাই !!' এই সমালোচনা লইয়া তখন চারিদিকে চিটি পড়িয়া গিয়াছিল—ট্রেণে, নৌকায়, গাড়ীতে, রাস্তায় সর্ব্বত্রই লোকের মুখে—পরিচিত অপরিচিত সকলেরই মুখে ঐ এক কথা,—'এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্ কালে দেখি নাই।' আমি ক্রমে জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম; ভাবিলাম, এত ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিয়াছি—কৈ, লোকমুখে ত সে সকলের সুখ্যাতি শুনিতে পাই না, আর এই একটা হাসির টিপ্পনীর সুখ্যাতিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ভাবিলাম, লোকে ভাল কথা, গম্ভীর কথা পড়িতে, মনে রাখিতে, চিন্তা করিতে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে,—আর সেই সঙ্গে রঙ্গরহস্য, ফষ্টিনষ্টির দিকে সকলের বেশী ঝোঁক হইয়াছে! এ লক্ষণ দেশের পক্ষে ভাল নয়। তাই তারপর থেকে আর বড় একটা রস-রচনা লিখিতে ইচ্ছা হয় না।" রস-রচনার কথা লিখিতে গিয়া এই সম্বন্ধে পিতার কৈফিয়ৎ স্মরণ হইল, তাই পাঠককে উহা জানাইয়া রাখিলাম।

ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে "রূপক ও রহস্য" প্রকাশিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, এ বিলম্বের কারণ কি? এই বিলম্বের প্রথম ও প্রধান কারণ অর্থাভাব; আর দ্বিতীয় কারণ পুস্তক প্রকাশিত হইলে বিক্রয় হইবে কিনা, সে বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ ছিল, এখনও আছে।

জানিনা কি কুক্ষণে বাবা পুস্তকের নাম রাখিয়াছিলেন সনাতনী, তাই আর তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল না। যাহা সনাতনী, তাহার কি আর সংস্কার হয়? কবি হেমচন্দ্রকে সাহিত্য-পরিষদের রাশীকৃত পুস্তকের বিরাট লাটের সঙ্গে মূল্য কমাইয়া দিয়া বিক্রয় করা

হইল। মোতিকুমারী বিলাতী মহিলা হইয়াও বিষম পর্দানশীন হইলেন; শুনিতেছি, এখনও তিনি দপ্তরী পাড়ায় নিভৃত কোণে লুকাইয়া পর্দা রক্ষা করিতেছেন। আমি মহা আগ্রহে, ভক্তিভরে মহাপূজার পূজোপকরণ, দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া দিলাম, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর, বঙ্গমাতার চিরসেবক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহা ঘটা করিয়া মায়ের বোধন করিলেন, কিন্তু জনসাধারণ প্রতিমাদর্শন করিল না, মাটির সাজে, মাটির গহনায়, খাঁটি দেশী বেশভূষায় এখন আর প্রতিমা মানায় না! তাই মনে বড় সন্দেহ আছে, হয় ত রূপক ও রহস্তের ভাগ্যেও এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে।

আর যে অর্থাভাববশতঃ পুস্তক-প্রকাশে এত বিলম্ব হইল শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সৌজন্যে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি। কিরূপে, তাহা বলিতেছি।

মহারাজ ৺দুর্গাচরণ লাহা আমাদের স্বগ্রামবাসী। তাঁহাদের সহিত আমাদের তিন পুরুষের পরিচয়। পিতামহের সহিত মহারাজ দুর্গাচরণের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল, পিতার সহিত রাজা হৃষীকেশ লাহার বিশেষ আলাপ ছিল এবং আমার সহিত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছে। আর এই পরিচয়ের ফল-স্বরূপ "রূপক ও রহস্তের" প্রকাশ। নলিনীবাবু কুমার নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া না দিলে, আমার সাধ্য ছিল না যে, যিনি একাধারে বাণীর বরপুত্র ও কমলার কোলজোড়া মাণিক তাঁহার দর্শন লাভ করি। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক হইলেও অতবড় পাণ্ডিত্যের নিকট, অতখানি উদার প্রাণের কাছে, এমন একটা মানুষের মত মানুষের সান্নিধ্যে আমি এখনও কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ি। কুমার নরেন্দ্রনাথের দর্শন-

লাভের সৌভাগ্য পাণ্ডা পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আর কুমার নরেন্দ্রনাথ? তিনি "রূপক ও রহস্যকে" "হৃষীকেশ-সিরিজের" অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন,—তিনি পিতৃদেবের নামের সহিত তাঁহার পিতার নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন,—তিনি এই পুস্তক-প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন,—একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে যাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই, তিনি তাহাই সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন,—এ কৃতজ্ঞতা কি শুধু ফাঁকা ধন্যবাদে প্রকাশ করা যায়? এ ঋণ যে অপরিশোধনীয়! শত শত দীন-দুঃখী, অনাথ-আতুর প্রতি নিয়ত কুমারের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছে,—কত সাহিত্যসেবী প্রতি দিন তাঁহার যশোগান করিতেছেন, আমিও ইঁহাদের সহিত কুমারের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এবং ভগবানের কাছে তাঁহার চিরমঙ্গল কামনা করিয়া আজ ধন্য হইলাম।

আর একজনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে আমাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে। তিনি আমার স্বগ্রামবাসী স্নেহাস্পদ সুহৃদ্ শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম, বি এ। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত, অতি যত্নপূর্ব্বক পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে আমি কখনই একলা এই কাজ শেষ করিতে পারিতাম না। আজকালকার দিনে যিনি নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করেন, তাঁহাকে কিরূপ ভাষায় ধন্যবাদ দিলে ঠিক উপযুক্ত হয়, আমি জানি না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ যেন এই নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রত তাঁহার জীবনের সাধনা করিতে পারেন।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

রূপক ও রহস্য

১

শুধুই রহস্য

পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'রত্ন-রহস্য' লেখেন; ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 'বিজ্ঞান-রহস্য', 'লোক-রহস্য' লিখিয়াছেন। ঐহিক-পারত্রিক বড় লোকদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত। ইতিহাসে আমার হাসি আসে; রত্ন—আমি চিনিতে পারি না; বিজ্ঞানে অজ্ঞান; লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই। কাজেই আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল। সুতরাং আপনাদিগকেও অগত্যা শুধুই রহস্য পড়িতে হইতেছে।

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলি হাঁগা, শুধুই রহস্য কি লিখিব?

সর্ব্বাগ্রে একালের ছাত্র বিস্মিত মুখে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—রাগ—অর্থ ভালবাসা; ঘৃণা—অর্থ দয়ামায়া।

তখন একালের শিক্ষক গম্ভীর মুখে বলিলেন, তা' নয়, শুধুই রহস্য এই যে,—

যে লেখে সে শেখে না,
যে শেখে সে লেখে না।

একালের দরিদ্র বক্ষে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, শুধুই রহস্য এই যে,—ক্ষুধায় যে ক্ষিপ্ত, শাকান্ন তাহার জোটে না।

ধনী উদরে হাত দিয়া তেমনই কাতর কণ্ঠে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—প্রচুরে যে বিভোর, মন্দাগ্নি তাহার ঘোচে না।

একালের সংবাদ-পত্র তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—গরীবের তেল-নুনের উপর বাটা চড়ানই রাজনীতি।

একালের রাজপুরুষেরা উত্তরচ্ছলে বলিলেন, আর শুধুই রহস্য এই যে,—রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি।

একালের সাময়িক পত্রসকল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—বহু পরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তা'ও যায় না, তাহার নাম অগ্রিম মূল্য।

একালের গ্রাহকরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি রাগ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র।

একালের আহেলেমামলা আদালতের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—ইষ্টাম্পের যে ব্যবসা, তাহার নাম ন্যায়রক্ষা।

আর পল্লীগ্রামের লোকে পুলিসকে দেখাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—দুপর রাত্রে যে চীৎকার, তাহার নাম শান্তি রক্ষা।

নাইট* সাহেব মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

সব চেয়ে দুঃখী এই ভারত ভূভাগে,
সব চেয়ে বেশী বেশী বেতনাদি লাগে।

গ্রিফিন † হাত কাম্‌ড়াইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে, তোমরা—

যা'র শিল তা'র নোড়া
তা'রই ভাঙ্গ্‌বে দাঁতের গোড়া।

তখন সেকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলাম। সেকালের শম্ভু খুড়ো ‡ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

মনের কথা খুলে বলিলেই বাতুল,
* * চেপে রাখিলেই প্রতুল।

সেকালের আমলা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

আমলাকে পয়সা দিয়া কাজ করাইলে অপব্যয়;
উকীলকে মোহর দিয়া কথা কহাইলে সদ্ব্যয়।

সেকালের শাশুড়ীরা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে—

ডাকিলে জামাই খায় না,
বাঁচিলে জামাই পায় না।

---

* ষ্টেস্‌ম্যানের প্রসিদ্ধ সম্পাদক রবার্ট নাইট।

† সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া এজেন্সির পোলিটিক্যাল এজেণ্ট লেপেল গ্রিফিন্‌ (Lepel Griffin) পরে সার হইয়াছিলেন। ইনি তখন পাওনিয়র পত্রিকায় ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করিতেন।

‡ 'রাইস এণ্ড রায়ত' পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রূপক ও রহস্য

সেকালের দিদিশাশুড়ীরা গালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

পোড়া দেশের দেখ কাপ,*—
যা' নইলে পেট ভরে না তারেই বলে সকড়ি,
যা' নইলে ঘর ভরে না তারেই বলে পাপ।

সেকালের বঙ্গদর্শন আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

"যুবকের ভিক্ষার নাম ঢেলাফেলানি, যুবতীর ভিক্ষা শয্যাতোলানি গুরুপুরোহিতের প্রণামি, জমীদার-নায়েবের সেলামি,—কিন্তু কেবল দরিদ্রের ভিক্ষাই লাঞ্ছনা রহিল।"

সেকালের হুতম-পেঁচা সহরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

এখানে খেঁদী পুতেরা—পদ্মলোচন,
আর পাষণ্ড ভণ্ডগুলা—ভাগবতভূষণ।

সেকালের সাধক রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুটা গজ দুটা অশ্ব স্থানে ব'সে কাল কাটালো,
আর ব'ড়ের ঘরে ক'রে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে ম'লো।

সেকালের মাতাল টলিতে টলিতে বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

বিশবাঁও জলের নীচে ইলিশ ঠাকুরাণী, সে হ'ল গরম,
আর সুয্যি খুড়োর লেজে বাঁধা ঝাঁটার ফল—ডাব
—সে হ'ল ঠাণ্ডা।

---

* ভঙ্গি, রকম।

শুধুই রহস্য

সেকালের পক্ষিকবি * আপ্‌শোষ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—ইংরেজ জাতি হ'ল জ্ঞাতি—উপার্জ্জনের অংশ চায়।

সেকালের ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

দাতায় দান করে,
হিংসকে হিংসায় মরে।

তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ শেষ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম দৈব ভারতী বলিতেছেন, "বাছা! একাল-সেকালের এত কথা শুনিয়াও এখনও বুঝিলে না যে, শুধুই রহস্য কি? তবে শুন,—সর্ব্বকালের শুধুই রহস্য এই যে,—

যে জানে, সে বলে না,
যে বলে, সে জানে না;
যারে চাই, তারে পাই না,
যারে পাই, তারে চাই না।

আরও রহস্য এই যে,—লোকে

ডাঙ্গায় ভাসে, জলে চষে,
দাঁতে হাসে, ঠোঁটে ভাষে।

তখন ভারতীর ভাষায় শুধুই রহস্য শুনিয়া আমি গলবস্ত্রাঞ্চলে মায়ের চরণাঞ্চলের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম; বলিলাম—আমি এবার শুধুই রহস্য

---

* রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী। ইনি নানাপ্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বুঝিয়াছি। প্রশ্ন হইল—কি বুঝিলে? আমি বলিলাম—সর্ব্বাপেক্ষা শুধুই রহস্য—অদ্যকার এই প্রবন্ধ। দেবীর হাসির ধ্বনি যেন শুনিতে পাইলাম; তিনি বলিলেন,—"তুমিই বাছা! রহস্যবিৎ, যাও ছাপ'।"

সুতরাং আমি ছাপিলাম।

মাঘ, ১২৯৪] [নবজীবন—৪র্থ ভাগ

২

নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা

১৮৭৪ হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। চারি পার্শ্বে দিন পার্লেমেণ্টের মহাসভা। তিন শত পয়ষট্টি মেম্বর আসিয়া, কেহ নিকটে কেহ দূরে, পর্য্যায়ক্রমে স্ব স্ব স্থানে বসিলেন।

সর্ব্বাগ্রে 'নিউয়ার্স ডে',—গৌরকান্তি, মুখে মদের গন্ধ ভর্‌ভর্‌ করিতেছে—গুরুভোজনে শরীর একটু মাটি মাটি—চোখ্‌ মিট্‌ মিট্‌—গাল টেপা, মুখে সুভোজনের হাসি। আমরা নামজাদা মেম্বরদিগকে চিনাইয়া যাইব।

ঐ দেখ, উহার কিছু পরে দেখ,—'পৌষ-পার্ব্বণ' পিঠা খাইয়া উদ্গার তুলিতেছেন এবং 'উত্তরায়ণ দিন'—নামাবলী গায়ে দিয়া প্রাতঃস্নানের শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছেন। তার কিছু পরে, 'বসন্ত-পঞ্চমী'—হরিদ্রাবর্ণের বসন পরিধান, হাতে আমের বৌল, যবের শীষ, মনে মনে আধ্‌খা গায়িতেছেন, আর পায়ে তাল রাখিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে বড় বড়মানুষ ছিলেন, এদেশে অনেক জমিদারী ছিল, এখন কেবল "পতিত" মহলেতে কত স্বামি-পুত্র-বিহীনা স্ত্রীলোকের নিকট খাজনা আদায় করিয়া দিন গুজ্‌রান করেন।

কিছু পরে, 'বাবু পূর্ণচন্দ্র দোল'—লাল চেহারা, লাল পোষাক, হাতে আবিরের মুটি। ইঁহার একটি অপকলঙ্ক আছে। ইনি

একটা মেড়া পোড়াইয়া খাইয়াছিলেন—লোকে বলে "নেড়া" পোড়াইয়াছেন। ইনি হোরি গায়িয়া লোকের মন হরণ করিতেছেন এবং অশ্লীলতা-নিবারণী সভাকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছেন। কিছুপরে দেখ, কুমার মহারৌদ্র 'চড়ক'—ঢাক ঘাড়ে করিয়া পিটিতেছেন। ইঁহার দৌরাত্ম্যে তিনটি বস্তু বিদীর্ণ হইত,—সন্ন্যাসীর পিঠ, ভদ্রলোকের কান, আর সজিনাখাড়া। রাজাজ্ঞায় এক্ষণে সন্ন্যাসীর পিঠ বাঁচিয়াছে, কিন্তু সজিনা-খাড়ার কোন উপায় হয় নাই,—শুনিতেছি নূতন আইন প্রস্তুত হইবে যে, সজিনাখাড়া আর না ফাটিতে পারে।

ইঁহার কাছে বসিয়া শীর্ণ-শরীর 'গুড্‌ফ্রাইডে'—একাদশীর মাসতুত ভাই। পরে, 'কুইন্স বার্থডেকে' ছাড়িয়া আসিয়া, 'দশহরা' মহাশয়কে নিরীক্ষণ কর। ইঁহার জমিদারী বাঙ্গালদেশে; প্রজাগণ বৎসরান্তে ইঁহার কাছারিতে পাপের খাজনা আদায় করিয়া, গঙ্গাজলের কবচ লইয়া যায়।

তারপরে দেখ, ব্রাদার্স 'রথ'—সোজা এবং উল্টা চূড়া মাথায় দিয়া, নিশান উড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহারা দুই ভাই বড় দুরন্ত—লোক ডাকিয়া জমা করিয়া, মেঘ ধরিয়া নাড়া দেয়—গরীবেরা জলে ভিজিয়া মরে। তখন উহারা হাসিতে হাসিতে গড় গড় করিয়া চলিয়া যায়। উহাদিগের নামে সম্প্রতি জ্ঞানকৃত বধের একটি নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল; সেই মোকদ্দমায় 'সাধারণীকে' কলির পক্ষে ওকালৎনামা দেওয়া হয় নাই—ইহা দুঃখের বিষয়; দিলে আমরা প্রমাণ করিতে পারিতাম যে, ব্রাদার্স রথ অনেক অপরাধে অপরাধী—যথা, উহারা সর্পবেশে মনুষ্য দংশন করে, কেন না উহাদের—"চক্র" আছে; উহারা গোপকন্যার সতীত্বাপহরণ করে, কেন না উহাদের চূড়া আছে; উহারা

মৃতদেহ—পূতিগন্ধে সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি করে, কেন না উহাদের ঠ্যাঙ্গে দড়ি দিয়া লোকে টানাটানি করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রথের পর, ‘ঝুলান’—উহার গলায় দড়ি,—সুতরাং আত্মহত্যার উদ্যোগী বলিয়া দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারানুসারে দণ্ডনীয়—কর্ম্মঠ ম্যাজিষ্ট্রেট-গণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। তারপর ‘অরন্ধন’—অনেক বাঙ্গালির ছেলের সঙ্গে উঁহার বিশেষ সাদৃশ্য—কেন না উঁনি কচু খাইয়া থাকেন।

উহার কিছু পরে—তিন জন সারি সারি দিনের রাজা—তিন ভায়ের নাম ‘দুর্গোৎসব’। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় কি দিব—আস্তাবলে সিংহ, দরজায় অসুর এবং উঠানে বেসুর (লোকে বলে যাত্রা)—বৈঠক্-খানায় সব নবকার্ত্তিক—ভোজনশালায় সব লম্বোদর গণেশ—দক্ষিণে দক্ষিণার লক্ষ্মী, শূলচক্র-গদাখড়্গ-ধারিণী মূর্ত্তি—দুঃখিনী সরস্বতীর প্রতি বাম! দুর্গা দশ হাতে সর্ব্বস্ব খাইয়া লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান! কেবল খালি কাটামো পড়িয়া থাকে। তখন ঘোর বিজয়ায় পড়িয়া সিদ্ধিসার করিয়া, বস্তুতে শূন্য দেখিয়া সিদ্ধিরস্তু আঃ! উঃ! করিয়া সম্বৎসর কাটাই।

ঐ দুঃখে দেখ, উহাদের কিছুপরে ‘কোজাগর’ ভায়া কেবল নারিকেল জল সার করিয়াছেন। কোজাগরের পরে অমাবস্যা ‘কালী-পূজা’। কোজাগর এবং অমাবস্যা—ব্রজধামে যেন কৃষ্ণবলরাম দুই ভাই; একজন রজতগিরি, একজন কালোমাণিক। বলরামের কপালে নারিকেল জল—কালোমাণিকের কপালে মদ্যমাংস। বৃন্দাবনেও ঐরূপ হইয়াছিল—বলরামের কপালে লাঙ্গল-জোয়াল—কৃষ্ণের কপালে ষোল শ’ গোপিনী! “সাধারণী” ভাবিয়া স্থির করিয়াছেন, এবার কালো কাগজে

কালো অক্ষরে কৃষ্ণকালী বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া দেখিবেন, কালো কপালে কি ঘটে। যোল শ' গোপিনীর পরিবর্ত্তে যোল শ' গ্রাহক পাইলে সন্তুষ্ট হইব, কেন না অধিক আশা করিতে নাই।

তার কিছু পরে দেখ, 'জগদ্ধাত্রী-পূজা' মহাশয়,—পায়ের উপর পা দিয়া, সিংহ এবং হস্তী লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। প্রায় দেখা যায়, 'বড়' বড়মানুষের কাছে 'ছোট' বড়মানুষ থাকিলে, ছোট বড়মানুষ বড় বড়মানুষের অনুকরণ করিতে ব্যস্ত হয়। জগদ্ধাত্রী-পূজা, দুর্গোৎসব-রাজবাড়ীর নকলে ব্যস্ত।

পূর্ণচন্দ্র 'রাস',—তিন ভাই বড় লোক ভাল নয়। মোহন্তের* তিন বৎসর ফাটক হইয়াছে, ভরসা করি ইহাদিগের এক এক জনের নয় বৎসর ফাটক হইবে। কত এলোকেশী, বদ্ধকেশী, সুকেশী, সুমুখী এবং সুবসনা সম্বন্ধে ইঁহারা দোষী, তাহা গণিয়া উঠা যায় না। রূপও ইঁহাদিগের মনোমোহন বটে,—জ্যোৎস্নার বস্ত্র, দীপমালার অলঙ্কার এবং চন্দ্রতারার মুকুট। এলোকেশীর দল মজিবে, বিচিত্র কি?

আইবড় 'কার্ত্তিক'-পূজার দিনের কোন গুণ নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া, লর্ড 'খৃষ্টমাসকে' দেখ। ইনি বিলাতি লর্ড—ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। নূতন কাপড়, নূতন জুতা, মদ, মাংস, মিঠাই মহার্ঘ্য করেন। ইনি গাঁদা ফুলের মালা গলায় দিয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া, নেশায় ঢুলু ঢুলু

---

* তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবচন্দ্র গিরির এলোকেশী নাম্নী কোন স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল। হুগলির সেসন জজ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৬এ নভেম্বর এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হইয়া, মেম লইয়া তা-রা-রা-রা গান করিতেছেন। আকারে বড় খর্ব্ব—নাম বড়দিন। কানাপুত্তের নাম পদ্মলোচন!

এই সমবেত তিন শত পয়ষট্টি দিবসের মহা সভামধ্যে বর্ষরাজ গাত্রোত্থান করিয়া রাজবাক্যের প্রচার আরম্ভ করিলেন,—বলিলেন,—

"হে সভাসদ্‌গণ! তোমাদের লইয়াই আমার রাজ্য। অতএব আমি যে প্রণালীতে রাজ্য করিব, তাহা রাজগণের প্রতিষ্ঠিত প্রথানুসারে প্রথম সভায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন :—

"আমার রাজ্যকালে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হইবেন এবং পশ্চিমে অস্ত যাইবেন। আমি তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে দিব না। কেন না, পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্ত জ্ঞান-প্রসাদাৎ যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, অকস্মাৎ তাহার পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

"চন্দ্র সম্বন্ধে সেরূপ হঠাৎ বলা যায় না। ইনি মাসে এক দিন মাত্র সম্পূর্ণভাবে উদয় হইয়া থাকেন, মাসে এক দিন একেবারে উদয় হন না এবং অন্যান্যদিনে স্বেচ্ছাক্রমে অসম্পূর্ণ উদয় দিয়া পলায়ন করেন,—পুরা কাজ করেন না। তাহাতে আপনাদের মধ্যে অনেকের প্রিয়তম রাত্রি-সুন্দরীগণের অন্ধকার-রোগে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমার ইচ্ছা আছে এখন আইন করিব যে, চন্দ্র প্রত্যহ ছয়টা দশ মিনিটে উদয় হইবেন এবং পাঁচটা তিপ্পান্ন মিনিটে অস্ত যাইবেন। তাঁহাকে একখানি ডায়রি রাখিতে হইবে, প্রত্যহ উদয়াস্তের সময় স্বহস্তে ডায়রিতে লিখিতে হইবে। আপনারা মধ্যে মধ্যে ডায়রি দেখিয়া ফলাফল আমাকে জানাইবেন।

"তারাগণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল; আমার ইচ্ছা আছে যে, উহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব। আপনারা এমত একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত

করুন যে, তারাগণ সকলে সারি বাঁধিয়া আকাশে উঠিবে—কেহ স্বশ্রেণী ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিবে না। এক এক সারিতে কত তারা উঠিতে পারে এবং কাহার কোথায় উদয় হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা অবধারিত করিবার জন্য আমি আকাশের একটি সেন্‌সস্‌ লইবার অনুজ্ঞা প্রচার করিব।

"আমার কাছে এমন অনেক নালিশ হইয়াছে যে, মেঘেরা যথা সময়ে জলদান করে না। ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। আমি ইহার সদুপায় করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিব। তাঁহারা অনুসন্ধান করিবেন যে, ১ম, আকাশে কত মেঘ আছে, ২য়, কাহার তহবিলে কত জল আছে, ৩য়, কে কোন্‌ তারিখে বর্ষণ করিতে সমর্থ, ৪র্থ, কোন্‌ দিনে কত ইঞ্চি জলের প্রয়োজন, ৫ম, কোন্‌ কোন্‌ দিনে কোন্‌ কোন্‌ বায়ু বহিয়া বৃষ্টির অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা করে এবং ৬ষ্ঠ, আকাশের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে মেঘের আড্‌ডা স্থাপিত করা যাইতে পারে। বৃষ্টি-ডিপার্টমেণ্টের একজন ডাইরেক্টার শীঘ্র নিযুক্ত করা যাইবে।

"আমি দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, জল নিম্নগামী। জলের নীচ প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার সংশোধনের উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমি জলকে উচ্চ গতি শিখাইব। এমন কথা শুনিতে পাই যে, এ রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার অভাব। জলের এই উচ্চ শিক্ষার দ্বারা সেই অভাব কতক পরিমাণে মোচন হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, দুর্ভিক্ষ নামে যে আমার আশ্রিত এবং অনুগত সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গে আনিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার পুষ্টিবর্দ্ধন করিও। শুনিতেছি সার জর্জ কাম্বেল* নামক এক জন মানবের সঙ্গে তাহার তুমুল

*সেই সময়ে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর। তখন লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট। কাম্বেল সাহেব ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ছোট লাটের পদ ত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যান।

যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ মানব আমার এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতির সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে, ইহা তাহার বীরতার পরিচয় বটে, কিন্তু এক জন মানুষের এতদূর স্পর্দ্ধা আমার সহ্য হয় না। অতএব আমি তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি।

"আর আর রাজাজ্ঞা তোমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। এক্ষণে সকলে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বঙ্গদেশে বিচরণ করিতে থাক।"*

১৩ মাঘ, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ১৪ সংখ্যা

* "আবার যাইবার সময় একটা ভয়ানক কুসমাচার প্রচার করিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'মনে করিয়াছ বঙ্গবাসিন্! যে, আমি যে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দুইটি চর রাখিয়া যাইলাম, তোমাদের গবর্ণর সাহেব তাহাদিগকে স্বীয় বলে বিদূরিত করিয়া দিবেন। সে আশাকে মনে স্থানদান করিও না। আমি সমাচার দিয়া যাইতেছি যে, সার জর্জ কাম্বেল তোমাদিগকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবেন, কোন আশা করিও না।' সকলে বিমর্ষ ও নিরাশ হইল, দুর্বৃত্ত স্বীয় সন্তান চুয়াত্তরকে ভার দিয়া চলিয়া গেল।"

—সাধারণী ; ১ ভাগ, ১২ সংখ্যা। প্রবন্ধ—"১২৮০ সাল।"

৩

চারিটি চুটকি

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি

দামিনী। সংস্কৃত পড়িবে বলিয়াছিলে, পড়িতেছ কি ?

যামিনী। না ভাই! পড়া হইল না। বর্ণ ও বানান শিখিয়াছিলাম।

দামিনী। তবে বই পড়িলে না কেন ?

যামিনী। একখানি প্রথম ভাগ "ঋজুপাঠ" বই কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তা কিন্তু পড়া হইল না।

দামিনী। কেন ?

যামিনী। পড়িলাম—"কস্মিংশ্চিৎ বনে", তারপর দেখি বড়ঠাকুরের কথা, আর কেমন ক'রে পড়ি বল' ?

বিনয়-বচন

বৃন্দাবনবাবু বড়ই বিষম উদ্ধত স্বভাবের লোক। নবীন তাঁহার মোসাহেব। এক দিন সে কথায় কথায় বলিল, "বৃন্দাবনবাবু কাজে বড় দক্ষ ও যোগ্য।" বিনয় কথাটা শুনিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিল। নবীন বলিল,—"হাসিলে যে ?" বিনয় বলিল,—"বৃন্দাবনবাবু কাজে বড় দক্ষ ও যোগ্য, তা বল্‌তে পারি না—তবে কাজে দক্ষযজ্ঞ করেন বটে।"

চারিটি চুটকি

কুঞ্জ-বিহারী

মাষ্টার কুঞ্জলালবাবু পঞ্চাশ বছর বয়সে হুগলি-কলেজ হলে এল, এ দিতেছেন। না দিলে বি, এ দিতে দেয় না; বি, এ, না দিলে পদোন্নতি হয় না। একটার অবকাশ-সময়ে কুঞ্জবাবু মালীর ঘরে তামাক খাইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পাড়ার আর একজন পরীক্ষার্থী বিহারীবাবুও উপস্থিত। কুঞ্জবাবুকে দেখিয়া বিহারী কুণ্ঠিত হইলেন। কুঞ্জবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হে বিহারিন্! আমাকে আর সমীহ কেন ভাই? এখন আমরা ত এক সূর্য্যে ধান শুকাই!" বিহারী মস্তক নত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তা এক সূর্য্যে ধান শুকাই বটে, তবে আমরা সকালে, আপনি বৈকালে!"

কৃষ্ণ-ভক্তি

রোগী। ডাক্তার কৃষ্ণবাবু এখনও আসিতেছেন না?

বন্ধু। সেদিন কামার-পাড়ার যে রোগীটাকে তত ডাকাডাকি করিয়াও জবাব পান নাই, আজি তাহাকেই ঔষধ খাওয়াইতে বিব্রত হইয়াছেন।

রোগী। তবে এবার সে কৃষ্ণকে জবাব দিবে!

চৈত্র, ১২৯৪] [নবজীবন—৪র্থ ভাগ

৪

গ্রন্থ-রহস্য

ভাষা-গুনে যাহা গ্রন্থন করা যায়, তাহারই নাম **গ্রন্থ**। গ্রন্থ করিতে পারিলেই **গ্রন্থকার**। গ্রন্থ কিরূপ—বুঝান' যাইতেছে। কোন কবি বলিয়াছেন,—মনুষ্য হাসি-কান্নার মধ্যে পেণ্ডুলম্; কেহ বলিয়াছেন,—মানুষ বড় বোকা; আবার কেহ বলিয়াছেন,—মানুষ বড় পাকা। তুমি গ্রন্থন করিলে—"মানুষ বোকামি ও পাকামির মধ্যে অপূর্ব্ব পেণ্ডুলম্।" নিশ্চয়ই তুমি গ্রন্থকার হইবার সুপন্থা পাইয়াছ।

প্রথমত—পাঠ্য ও অপাঠ্য ভেদে গ্রন্থ দ্বিবিধ। যাহা পাঠ করিতে হয়, তাহা **পাঠ্য**,—যেমন বোধোদয়, নীতিবোধ প্রভৃতি। কেন না বোধোদয়, নীতিবোধ না পড়িলে উচ্চ শ্রেণীতে যাওয়া যায় না, পাস করা যায় না; পাস না করিলে ডিগ্রী হয় না; ডিগ্রী না হইলে মুন্‌সেফি, মাষ্টারি, মোক্তারি, মজুরি,—মনুষ্যত্বের কিছুই হয় না। অতএব বোধোদয় ও নীতিবোধ পাঠ্য। কিন্তু কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষিতীশ-বংশাবলি—এ সকল না পড়িলে পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যত্বের হানি হয় না,—অতএব ঐ সকল **অপাঠ্য**। সুতরাং বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িক পত্র ও সংবাদ-পত্র—অপাঠ্য।

ফাদার * লাফোঁ ও ব্রাদার † সরকার উভয়েই গণনায় স্থির করেন যে, গ্রন্থ জড়পদার্থ। আমরা বিশ্বাস করি, কেন না ইন্সপেক্টর প্রভৃতি কেহ না চালাইলে পুস্তক চলে না। ‡

দ্বিতীয়ত, গদ্য-পদ্য ভেদে গ্রন্থ আবার দ্বিবিধ। যাহাতে ভাল ভাল গদ্ আছে, তাহা গদ্য। গদ্ নানা প্রকার, যথা—"দশরথ রাজার চারি পুত্র ছিল,—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।" "ক্ষুধা পাইলে আহার করিতে ইচ্ছা হয়।" "অম্লজান ও জলজানে জল হয়।" "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।" যাহাতে ভাল ভাল অথচ ভূরি ভূরি গদ্ আছে তাহাই উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ। প্রমাণ বাঙ্গালার সমস্ত বিজ্ঞান-গ্রন্থ।

যাহাতে ভাল ভাল পদ থাকে, তাহা পদ্য,—যেমন, ঘুমন্ত জোছনা, ফুটন্ত চন্দ্রিমা, জাগন্ত সূর্যামামা, বাসন্তী বর্ণনা। ভাল পদের 'পদে পদে মিল,' কাজেই পদ্যে প্রায়ই মিল থাকে। মিল থাকিলে তাহার নাম মিলন-পদ্য বা মিত্রাক্ষর। গরমিল হইলে তাহার নাম বেমিল পদ্য বা শত্র্ক্ষর। তখনকার লোক মিলে মিশে থাকিত, কাজেই তখন মিল পদ্য বেশী ছিল; এখন কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই, কাজেই শত্র্ক্ষরের আদর বেশী।

কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি ভেদে গ্রন্থ আবার অনেক প্রকার হয়। কাবিকে ভাল কথায় কাব্য বলে। স্বরূপও নয়, বিদ্রূপও নয়, এমন একটা উদ্ভট বা উৎকট কিছু করিতে পারিলেই তাহাকে কাব্য বলে।—যেমন, "রাম নরকে গিয়া দশরথকে প্রথমে প্রণাম করিয়া

---

*সেণ্টজেভিয়ার কলেজের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য। † ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

‡ বোধোদয়ের পুত্তলিকা-তত্ত্ব দেখ।

পরক্ষণেই তাঁহার কান মলিয়া দিলেন।” “বসন্তের প্রভাতে শেফালিকা গন্ধ বিস্তার করিতেছে, অশ্বথ শোঁ শোঁ করিতেছে, এমন সময় বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক তাল পতিত হইল! জয় ব্রহ্মসনাতন! এ কি চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কুমারী যে!!!” ইত্যাদি—কাব্য।

ইতিহাস অর্থ—এই হাসো। “সিরাজদ্দৌলার আদেশে অন্ধকূপে ১২৪ জন ইংরাজ হত হন,” “লক্ষ্মণসেন পলায়ন করায় মুসলমানের বঙ্গ-বিজয় সমাধা হইল,” “গুজ্‌রাট ও গুজরান্‌ওয়ালার যুদ্ধে ইংরাজ বিশেষ জয়ী হইলেন;”—এই সকল হাসির কথা বলিয়া ইতিহাস নামে গণ্য।

বিজ্ঞান—যাহাতে বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিজ্ঞান। যেমন সহজে বোধ হয়, শৈত্য একটা পদার্থ,—নহিলে তাহাতে হাত-পা কন্‌ কন্‌ করিবে কেন? কিন্তু বিজ্ঞান শিখিলে বলিতে হইবে, না— শৈত্যটা কিছুই নয়। তেমনই বিজ্ঞান জানিলে বলিতে হইবে যে, কৃষ্ণবর্ণ—ওটা বর্ণই নহে, ওটা কিছুই নহে।

গ্রন্থ সাধারণত জড় বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা-বিভাগের শক্তিবলে সেই জড়ে চৈতন্য হয়। সে কিরূপ শক্তি, তাহার বিচার এ স্থলে সঙ্গত নহে। অতএব গ্রন্থ-রহস্যের অন্ত এই পর্য্যন্ত।

রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে॥

পৌষ, ১২৯৫] [নবজীবন—৫ম ভাগ

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য*

আপনারা বোধ হয় গৃহস্থ শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ ও সংসার-বিরাগী আজু গোঁসায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প শুনিয়া থাকিবেন। কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদের বাড়ীর পাশেই একটি ছোট আমবাগান ছিল; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, খট্‌খটে; নিবিড় ছায়াময় অথচ বায়ু সর্ব্বদাই ঝর্ ঝর্ করিতেছে। আহারান্তে রামপ্রসাদ সুধাপানে ‡ ভোর হইয়া, সেই বাগানে মাদুরি পাতিয়া তামাকু খাইতেন, বিশ্রাম করিতেন, আর আপন মনে শ্যামাগুণ গান করিতেন। বাগানের পার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী; পরপারে আজু গোঁসায়ের আখ্‌ড়া। বাবাজিও ছোট কলি হুঁকাটিতে গাঁজা সাজিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। রাম-

---

* দিগম্বর ভট্টাচার্য্য কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহেন—গ্রন্থকারের কল্পনোদ্ভূত রসের মূর্ত্তি। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসায়ের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনা যায়, দিগম্বরও যেন সেই ভাবে রাজা রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের পাল্‌টা জবাব দিতেন। বলা বাহুল্য, দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সমস্ত গান গ্রন্থকারের নিজের রচনা। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর গানে" ক্রমক্রমে ভট্টাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গান মুদ্রিত হইয়াছে।

‡ "সুরাপান করিনে আমি—সুধা খাইরে কুতুহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজি, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥"

রামপ্রসাদের গান।

প্রসাদের গান বুঝিতে পারিলে, কখন কখন বাবাজি তাহার উত্তর-স্বরূপ আর একটি গান গাহিতেন। শাক্তে বৈষ্ণবে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে,—আপনারা অনেকেই বোধ হয়, তাহা দেখিয়াছেন অথবা সেই কাহিনী শুনিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় আপনারা অনেকেই দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির কথা আজি আপনাদিগকে উপহার দিব।

আজু গোঁসাই যেমন সাধক রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, দেশভক্তিপূর্ণ, তেজস্বী, মনস্বী মহাপুরুষ; দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, রামমোহন রায়-কৃত কতকগুলি গানের উত্তরে তিনি কতকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বাদ-প্রতিবাদও বড় বিস্ময়কর।

আজু গোঁসায়ের সহিত যে রামপ্রসাদের সখ্য ছিল, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ভট্টাচার্য্যের নিবাস এই কলিকাতাতেই হইবে। যখন রামমোহন রায় কলিকাতাতে বাস করিতেন, তখন ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন; এরূপ প্রবাদ যে উভয়ে একত্র সুরাপান করিতেন। যাহাই হউক, দিগম্বরে রামমোহনে বিশেষ সখ্যভাব ছিল; উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিচার-বিতর্ক হইত। সকলেই জানেন, মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে অনিত্য সংসার মিথ্যা, একমাত্র নিত্যনিরঞ্জনই সত্য। জগদীশ্বরের মহিমা-চিন্তনই,

মহাত্মার মতে, তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সগুণ, সাকারবাদী, পৌত্তলিক এবং তন্ত্রমতে আদ্যাশক্তির উপাসক।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের গানগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই তাঁহার রীতি-নীতি, উপাসনা-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। গানগুলি সমস্তই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রচিত প্রচলিত কয়েকটি গানের প্রত্যুত্তর মাত্র। সুর, তাল অনেক সময়েই এক, অনেকগুলিতে কথায় কথায় মিল আছে, কেবল দুই দশটা শব্দ পরিবর্ত্তিত করা এবং দুই একটি কলি নূতন বাঁধা। কিরূপ গুণপনা—পরের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রামমোহন রায়ের গান,—

(বসন্তবাহার—আড়াঠেকা)

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা,
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা।
যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র
নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না।
জানিতে তার পরিশ্রম,
করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা।
বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ,
কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান,
আছে মাত্র এই জ্ঞান অতীত ভাবনা।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(বসন্তবাহার—আড়াঠেকা)

কেন ক্ষেপা কর তবে তাঁহার সাধনা,
নির্গুণ যদি তিনি, রহিত কল্পনা ?

* * *

"আছে মাত্র" এই জ্ঞান—
তবে কেন গাও গান,
চক্ষু মুদি কর ধ্যান, কিসের ভাবনা ?

রামমোহন রায়ের গান,—

(সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা)

তুমি কার কে তোমার,
কারে বল রে আপন ?
মহা মায়া-নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে,
নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে যায় নানা স্থান ;—
তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।

কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন ;
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা)

মা আমার, আমি তাঁর,
তাঁরে বলি রে আপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন ?
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে, আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য সত্য এ সংসার
চিন্ময়ী-চরণ-চিন্তা সংসার-বন্ধন।*

রামমোহন রায়ের গান,—

(বেহাগ—আড়াঠেকা)

মন একি ভ্রান্তি তোমার,
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার ?

---

* ভট্টাচার্য্যের ভাব যেন এইরূপ বোধ হয় যে, চিন্ময়ী ও সংসার—দুই-ই সত্য, আর সংসারী কর্ত্তৃক চিন্ময়ী-চিন্তা, চিন্ময়ীর সহিত সংসারীর একমাত্র বন্ধন।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কে, বা আন কাকে—এক চমৎকার।
অনন্ত জগতাধারে, আসন প্রদান কারে ?
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে—একি অবিচার।
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(বেহাগ—আড়াঠেকা)

ভ্রান্তিতে—শান্তি আমার।
আবাহন বিসর্জ্জন ক্ষতি কিবা কার !
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি—বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি—এসো ব্রহ্মময়ি, করগো নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধন করি
ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর।

রামমোহন রায়ের গান,—

(সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা)

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে ;
কোথায় কুশল তব—আয়ুক্ষতি দিনে দিনে ?
দারাসুত প্রভৃতি কেহ না হইবে সাথী,
জ্ঞান করি অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে ;

যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা)

লোকে জিজ্ঞাসিলে বলি, ভাল আছি খোলা প্রাণে ;
ভাল মায়ের বেটা আমি, ভাল না থাকিব কেনে ?
দারাসুত প্রভৃতি সকলে সাধনা-সাথী,
চক্রে করি অবস্থিতি, মত্ত থাকি সুধাপানে।
তন্ত্রে মন্ত্রে ভর করি, ভাবি সেই দিগম্বরী ;
ইন্দ্রিয় গেল বা র'ল কখন ত ভাবিনে।

রামমোহন রায়ের গান,—

(কেদার—আড়াঠেকা)

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা,
অনিত্য যে দেহ মন—জেনে কি জান না ?
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে,
বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে—
এক বার ভাবিলে না।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমোগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন—এ বিপত্তি রবে না।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(কেদার—আড়াঠেকা)

ওঁকারে মত্ত মন অপার বাসনা।
দেহ সত্য, মন সত্য, সত্য শ্যামা-সাধনা।

শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়,　　　আসে যায়, রয়, হয়,
　　পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা।
অতএব শুন বলি,　　　ত্যজ মিথ্যা মিথ্যাবুলি ;
　　সত্যময়ী তথ্য লও, যাবে ভাবনা।

রামমোহন রায়ের গান,—

(ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।)

এ কি ভুল মন। (তোমার)
দেখিবারে চাহ যারে—না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,　　　যে ব্যাপিল আকাশেরে,
　　আকাশের ন্যায় তাঁরে মানা এ কেমন ?
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত,　　　যে চালায় অবিরত,
　　তাঁরে দেখাইতে করহ যতন।
পশুপক্ষী জলচরে,　　　যে আহার দেয় নরে,
　　চাহ সেই পরাৎপরে করাতে ভোজন।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(প্রসাদী সুর—একতালা।)

ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ওই !
আঁধারে করিছে আলো　　ঐ যে আমার ব্রহ্মময়ী।
পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে,
লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়নে নিকলে,
বদনে মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

অট্ট অট্ট হাস,   বিকট বিকাশ
ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী।
করাল বদনে সরল হাসিছে,
মরাল-গমনে মেদিনী কাঁপিছে,
তালে তানে তালে সুঠাম—
নাচিছে তাথৈ তাথৈ।

রামমোহন রায়ের গান,—

(ললিত—আড়াঠেকা)

কোথা হতে এলে, কোথা যাইবে কোথা রে।
নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন,
প্রপঞ্চ জগতে তেমন ভ্রমে সত্য-দরশন।
অতএব দেখ বুঝে, যিনি সত্য ভজ তাঁরে।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(ললিত—আড়াঠেকা)

কোথা হতে এলাম আমি,
যাইব কোথায় রে?
মা আমার, আমি মার,—
ভাবনা কি তায় রে!
ভক্তিভরে দেখিতেছি জাগ্রতে খেয়াল—
আমার মায়ের আমি স্নেহের ছাওয়াল;
তাঁহার কোলেতে শুয়ে
ধরিয়াছি রাঙ্গা পায় রে।

রামমোহন রায়ের গান,—

(বেহাগ—একতালা)

মন তোরে কে ভুলালে হায় !
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায় !
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায় ।
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেক স্থাপহ, ক্ষণে করহ সংহার ;
প্রভু বলি মান যাঁরে, সম্মুখে নাচাও তাঁরে,
এত ভুল এ সংসারে কে দেখে কোথায় !

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(ভৈরবী—মধ্যমান)

ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী ;
কল্পনারে সত্যকরি দেখা দিলা জননী ।
কল্পনায় অধিষ্ঠান, কল্পনায় দেই প্রাণ,
সত্য করি আত্মদান, এইমাত্র জানি ।
কখন ভূষণ দেই, কখন অশন,
কখন স্থাপন করি, কভু বিসর্জ্জন,
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে নাচিছে বাপের বক্ষে,
ভয়ে বলি, সর্ব্বরক্ষে কর সর্ব্বরূপিণি ।

রামমোহন রায়ের গান,—

(ইমন ভূপালী—ঢিমা তেতালা)

ভুল না নিষাদ-কাল পাতিয়াছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্যসুখে জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু-নির্ভর, অমৃতাক্ত ফলচয়
পাইবে ভোগিতে কত আনন্দ-বিহঙ্গ।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(ইমন ভুপালী—ঠেকা তেতালা)

দেখ রে! বুদ্ধি-নিষাদ
পাতিয়াছে জ্ঞান-ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে চল চল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
কর্ম্মরথে ভক্তিপথে করহ গমন;
মিলিবে মুক্তির ফল, মধু তাহে অবিরল,
মত্ত হবে সুধাপানে দেখিবে যে রঙ্গ।

রামমোহন রায়ের গান,—

(পূরবী—আড়াঠেকা)

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষণে
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি কহে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে ;
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(পূরবী—আড়াঠেকা)

তিলে তিলে পরমায়ু বাড়িতেছে প্রতি ক্ষণে,
ধীরে ধীরে ভক্তিনদী ধায় শ্যামাচরণে।
বৃদ্ধি পায় আয়ু যত, পুত্র হয় মাতৃরত,
কোলে টানে মা যে তত আপন সন্তানে।
পরের কথার ছলে,
পুত্র কি আর টলে, বলে,—
ভয় নাহি আর সেই কালের দশনে।
এক চিন্তা নিরন্তর—মারে পোয়ে একঘর,
ভেদ নাহি অতঃপর জীবনে মরণে।

রামমোহন রায়ের গান,—

(রামকেলী—আড়াঠেকা)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,—
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া—
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টি হীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান,—

(পূরবী—আড়াঠেকা)

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর,
আধনীরে গঙ্গাতীরে শঙ্কাহীন নর।
কাটায়ে সংসার-মায়া, আশীর্ব্বাদি পুত্র-জায়া
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে, করি উচ্চ স্বর।
কালী নাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।

মাঘ, ১২৯২] [নবজীবন—২য় ভাগ

৬

চনকচূর্ণ

(ভক্তি)

পিতৃভক্তি

একজন আলবর্ট ফ্যাশনি অর্থাৎ মাথায় সিঁথিকাটা বাবু এক দিন পাঁচজন ইয়ার-বন্ধু লইয়া, অল্প খোস মেজাদে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থানের সম্মুখ দিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা যাইতেছিলেন। তাঁহার বসন মলিন, পরিধেয় বস্ত্র ক্ষুদ্র ও স্থূল-সূত্র-গ্রথিত; পদ পাদুকাবিহীন ও হস্তে বংশ যষ্টি। ইয়ারের মধ্যে একজন তাঁহাকে অল্প চিনিত, বলিল,—"কি হে শ্যামবাবু, তোমার বাপ যাইতেছেন নয় ?" শ্যামবাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ আঁ—তা-আ এমন কি বাপ !!!"

মাতৃভক্তি

ঐ শ্যামবাবুর মত আর একজন যুবকের অশিষ্টাচরণে তদীয় মাতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাছা নবীন ! তোর জন্য যে বাবা পাড়ায় মুখ দেখাইতে পারি না ! তোকে কি বাবা এই জন্য দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ?" তাহাতে নবীন উত্তর করিল,—"মা, তুমি গর্ভ গর্ভ ব'লে রোজ রোজ মুখ নাড়া

দিও না। গর্ভটা কি?—এক হাত খোয়ার গুদাম বৈ ত নয়? দশ মাস দশ দিনের ভাড়া পাবে বৈ ত নয়? না হয় পূরা এগার মাসের লও; বড় অধিক সালিয়ানা হিসাবে না হয় এক বৎসরের লইবে। গুদাম-ভাড়ার জন্য রোজ রোজ এত মুখ নাড়া কেন? পাঁচ জনকে ডাকিয়া চুকাইয়া লও।”

গুরুভক্তি

পল্লীগ্রামে কোন গৃহস্বামীর বাটীতে চাকর, কৃষাণ সকলেই পীড়িত ছিল। কে তামাক সাজিবে, সেই বিষয়ে তর্কবিতর্ক হওয়ায়, (গৃহস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান বিলক্ষণ ছিল এবং তাঁহার ইষ্টদেব সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন,) তিনি গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভক্তিভাবে বলিলেন,—“ঠাকুর-মহাশয় থাকিতে আমার বাড়ী আর কেহ তামাকু সাজিতে পারিবে না।—সকল ক্রিয়াকাণ্ডে উনিই আমার কাণ্ডারী!”

দেবভক্তি

একজন গৃহস্থ এইরূপ উইল করিয়া যান,—

“কস্য ইচ্ছাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, যে হেতুক আমার শরীর অসুস্থ, কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না, তাহাতে জ্ঞান পূর্ব্বক এইরূপ নিয়ম করিয়া যাইতেছি যে—

১ দফা—আমার মরণান্তে আমার ত্যাজ্য স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ভবদেব পালিত দখলিকার ও স্বত্ববান্ হইবেন, কেবল—

২ দফা—রঙ্গমণি নামে যে বেওয়া আমাকে বহুদিনাবধি সেবাশুশ্রূষা করিতেছে, তাহার সোনারূপার অলঙ্কারাদি ঐ রঙ্গমণিরই রহিল: আর

খিড়কির দক্ষিণে নীচের লিখিত চৌহদ্দী অন্তর্গত ⁄৩ কাঠা ভূমি, যায় তদুপরিস্থ এক কাহিঘর ঐ রঙ্গমণির রহিল। এবং

৩ দফা—ডিল জলার মাঠে ৮⁄ বিঘা নিষ্কর ভূমি, যাহা রামসেবক চৌধুরী মোকদ্দমা জিতিয়া এক্ষণে দখল করিতেছে ও যাহাতে আমার সম্পূর্ণ হক আছে, সেই ভূমি ও তাহার উপস্বত্ব এবং যে সকল তৈজসাদি গত বৎসর বৈশাখ মাসে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়—ঘড়া, ঘটি, বহুগুণা, থালা প্রভৃতি—সেই সকল তৈজস ও আজি ছয় মাস হইল আমার ভদ্রাসন বাটীর উত্তর দিকের দাঁড়াগাছির মাঠে পালে চরিতে গিয়া যে কেলে বক্‌নাটা হারাইয়া গিয়াছে, সেই বক্‌না গোরুটি আমি পিতৃপুরুষের স্থাপিত ৺জনার্দ্দন ঠাকুরের সেবা-বৃত্তি জন্য অর্পণ করিলাম। উক্ত ভূমি-সম্পত্তি, গো এবং তৈজসাদিতে আমার পুত্র উক্ত শ্রীমান্ ভবদেব পালিতের কোন স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না। এতদর্থ সুস্থ শরীরে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক ইচ্ছাপত্র লিখিয়া দিলাম।

ইত্যাদি

শ্রী————————

সাধারণী-সম্পাদক।

পাঁচকড়ি রায়, সাং চুঁচুড়া। *

পতিভক্তি

বিমলা ও অলকায় তালপুকুরের ঘাটে বসিয়া কথোপকথন হইতেছে। বেলা দুই প্রহর। বিমলার গলায় নূতন পাঁচনলি; বলিতেছেন,—"পাঁচ-নলির কথা আর বলিস্‌নে বোন্। কাল সকালে আম তাঁকে বলিলাম যে, তুমি পাঁচনলি দেবে তবে ত আমি পরিব! তুমি পাঁচনলি নিয়ে

* ইনি 'সাধারণী'র ম্যানেজার ছিলেন।

তবে আর ঘরে এস'। তিনি সেই কথাতে সেই যে সেকরাবাড়ী গিয়ে বসিলেন, আর উঠিলেন না। আমি রাঁধাবাড়া ক'রে মনে করিলাম, তিনি পাঁচনলি আনিলে আমি ধীরে সুস্থে পরিতে পাবনা,—এই বেলা চারিটি খেয়ে নিই। খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু আলস্য হ'ল, শুয়েছি ত অমনি বোন্ ঘুম এয়েছে। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে দেখি যে, তিনি এসে পায়ে হাত দিয়ে উঠাইতেছেন। অমনি ধড়্মড়িয়ে উঠিয়া বলিলাম, 'কই, পাঁচনলি কই ?' তিনি হাসিতে হাসিতে আমায় পাঁচনলি দেখালেন, আর বলিলেন যে, 'এই লও, এই পর।'

আহা! বোন্, তাঁর আহ্লাদেই ত আমার আহ্লাদ। হাজার হ'ক স্বোয়ামী, পরম গুরু! তাঁর কথাতে আর এই পাঁচনলি দেখে আহ্লাদে গলে গেলাম,—আপনি সন্ধ্যার পর কখন দুটা খেয়েছিলাম তাহা মনে নাই, তবে তাঁর আহ্লাদে আর পাঁচনলি গলায় দিয়ে মন এম্নি হ'ল যে, তাঁকে খাওয়াতে ভুলে গেলাম। রাত্রি কমেন দিয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়িয়াছিলাম, কিছু টের পাই নাই। তাই বোন্, বলি সকাল সকাল চারিটি বেঁধে দিই গে, কাল অবধি তিনি কিছু খান নাই। তাই তাড়াতাড়ি ক'রে দুটা বাড়াভাত ছিল, তাই মাছপোড়া দিয়ে খেয়ে— স্নান করিতে আসিয়াছি। গাটায় কেমন ময়লা হইয়াছে, আর মাথাটায় কেমন আটা আটা হইয়াছে, তাই আসবার সময় একটু হলুদ আর একটু খইল লয়ে আসিলাম। অলকা! মাথাটা একটু ঘষে দেনা বোন্, পোড়া চুলগুল লয়ে মলাম। দে বোন্! আবার সকাল সকাল গিয়ে বেঁধে দিলে তবে, কাল অবধি উপোসী রয়েছেন, ভাত পাবেন। হাজার হ'ক স্বোয়ামী—কেমন কথা!!!"

১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ৬ সংখ্যা

৭

তুলনায় সমালোচন

ক

অনেকে বলেন যে, তুলনায় সমালোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী হয়, অথচ এখনকার কোন সমালোচকই সেরূপে সমালোচনা করেন না। আমরা মধ্যে মধ্যে সমালোচক বলিয়া সমাজে মুখ দেখাই, সেই জন্য অদ্য ঐ আক্ষেপোক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলনায় সমালোচনের চেষ্টা করিব। সুতরাং বঙ্গীয় সমালোচকদিগের কথায় যে আমাদের অচলা ভক্তি, এই প্রস্তাব তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ।

আমাদের উপদেষ্টৃগণ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীর ন্যায় শুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত তুলনা করিয়া কোন কোন কবির বা কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমালোচন করিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যতদূর স্মরণ আছে দুই একটি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

একজন বিদ্যাপতি ও কবিকঙ্কণের তুলনা করিয়া আমাদের দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বিদ্যাপতির পদগুলি সরল প্রোষ্ঠী মৎস্যের দলের ন্যায়। সকলগুলিই প্রায় একরূপ, দেখিলেই চেনা যায়; এক একটির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমস্ত দলটি সুবৃহৎ;

চকলগুলি অতি চিক্কণ, উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, সরল, মোলায়েম ও আপনাদের বাস্তভূতে সর্ব্বদাই ফর্ ফরায়তে। বিদ্যাপতির পদগুলিও ঠিক এইরূপ; একটির সহিত আর একটির কোন সম্বন্ধই নাই; সকলগুলিই পদ ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক; প্রোষ্ঠীদল সম্বন্ধেও তদ্রূপ, সকলগুলিই মৎস্য—তৈল, লবণ ও জিহ্বার সহিত সমান সম্বন্ধ। পদগুলিও অতি সরস, কোমল, মিষ্ট, ক্ষুদ্র ও আপনাদের বাস্তভূতে অর্থাৎ কীর্ত্তন-গায়কদিগের কণ্ঠে সর্ব্বদাই ফর্ ফরায়তে। অপিচ মৎস্যগুলি সুন্দর শল্কাবৃত, কিন্তু সেই শল্কগুলি অব্যবহার্য্য; পদগুলিও সুন্দর ব্রজভাষাময়, কিন্তু ব্রজভাষা অব্যবহার্য্য। বিদ্যাপতির কবিতার সকলগুলিই আদিরসময়ী, আদিরসোদ্দীপিকা; আর এই সফরীযূথের যেটিকে দেখিবে, দেখিলেই তোমার সেই নিজ সফরী-নয়নাকে মনে পড়িবে, সুতরাং এ স্থলেও সকলগুলি আদিরসোদ্দীপিকা।

কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল' বৃহৎ রোহিত-মৎস্য-সদৃশ; সুবৃহৎ, একটিতেই যথেষ্ট, সুন্দর, স্বচ্ছন্দোধারী, অগাধসঞ্চারী, স্বচ্ছন্দবিহারী, জালভেদকারী। যেমন মৎস্যকুলে রোহিত, তদ্রূপ কাব্যকুলে চণ্ডীমঙ্গল—রাজা বলিলেই হয়; অতি সুন্দর, একটিতেই যথেষ্ট, নানা ছন্দে রচিত, অগাধপাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক, স্বচ্ছন্দবিহারী অর্থাৎ কষ্টে রচিত হয় নাই ও জালভেদকারী, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এমন কূট যে, তাহার অর্থ শব্দবুদ্ধিজাল ভেদ করিয়া পলায়ন করে।

চণ্ডীকাব্যে যেমন নানা রস আছে, তেমনি বৃহৎ পক্ক রোহিত মৎস্যেও নানা রস আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ রস আছে, সে বিষয়ে নানা মত আছে; কেহ কেহ বলেন যে, ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র ও ভয়ানক; মধ্যদেশে শান্ত, করুণ ও আদি এবং পশ্চাৎ ভাগে অদ্ভুত, হাস্য ও

বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়। অপরে বলিবেন যে, ইহার ঘ্রাণে আদি, দর্শনে করুণা, স্পর্শনে অদ্ভুত ও ভক্ষণেই শান্ত রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহা যে চণ্ডীকাব্য-সদৃশ নানা রসাত্মক তাহাতে মতভেদ নাই। আমাদের প্রথম উপদেষ্টা এইরূপে আমাদিগকে তুলনায় সমালোচনের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার তুলনা অতুলা বলিতে হইবে।

পরে এক জ্ঞানী সমালোচক আমাদিগকে আর একটি তুলনা শুনান, তাহাও দেওয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই; টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসায় করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে Queen Victoria (কুইন ভিক্টোরিয়া) ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক্ ছাঁটিয়া, উপরে "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত" ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। "বর্ণ-পরিচয়" দুআনি; ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা।

তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান; সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান, সে টাকার নাম— "বেতাল পঁচিশ"; সেবার চেম্বর্স ব'লে একজন বিলাতী মহাজনের নিকট রূপা লইয়া "জীবন-চরিত" নাম দিয়া, একটু কম খাদ মিশাইয়া ক'হাজার

আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই "সীতার বনবাস" নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসায় ছাড়েন নাই,—আজি চারি বৎসর হইল সেক্সপিয়রের "ধোঁকার-মজা" ব'লে খানিক রূপা ছিল, তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া "ভ্রান্তিবিলাস" টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রতিপন্ন করিলেন যে, বিদ্যাসাগর টঙ্ক-যন্ত্র মাত্র।

আর একজন উপদেষ্টা বলেন যে, দীনবন্ধুবাবু কাঁচামিঠা আম গাছ। "নীলদর্পণ" তাহার মুকুল, তখন একবার দক্ষিণ-মলয়-বায়ুতে তাহার সৌরভ দিগ্বিস্তার করিয়াছিল; তাঁহার 'নিমচাঁদ', 'মল্লিকা', 'শ্রীনাথ', 'ক্ষীরোদবাসিনী' প্রভৃতি তাহার সেই কাঁচা অবস্থা; আর তাঁহার "দ্বাদশ কবিতা", "সুরধুনীতে" সেই ফল যে পাকিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আর একজন বলেন, বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর "বঙ্গদর্শন" সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক মিষ্ট লাগিবে, খানিক অম্লরসময়; অম্ল—শুধু খেতে ভাল লাগে না, কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হ'লে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে, তাহার হাড়ে হাড়ে শ্ব-শ্ব করিবে।

আমরা তুলনায় সমালোচন সম্বন্ধে আমাদের উপদেষ্টৃগণের স্থানে এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এক্ষণে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

৫

আমরা রায়গুণাকার ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরামালিনী এক. বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়নকর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক।

প্রথমে মালিনীর চিত্র—

"সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী,
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ;
কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম,
দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম ;
গালভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে,
কানে কড়ি, কড়ে রাঁড়ী, কথা কয় ছলে ;
চূড়াবান্ধা বান্ধা চুল, পরিধান শাদা সাড়ী,
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া—তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র জানে কতগুলি,
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ;
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়,
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ;
মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাত নাড়া,
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া।'

এই চিত্রের সহিত কবি ভারতের তুলনা করুন।

প্রথমত—"কথায় হীরার ধার।" কবি ভারত কথার রাজা। নানা

ভাবের কথা, নানা রসের কথা তাঁহার গ্রন্থকলাপ-মধ্যে আছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন,—

"অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়,
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয় ;
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা-সাক্ষী পাবে,
যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে মাতাবে ;
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা,
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহাতে বলা হইল যে, তাঁহার দৈব শক্তি ছিল। আবার বলিয়াছেন,—

"মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী,
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ;
পড়িয়াছি সেই মত, বর্ণিবারে পারি,
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ;
না রবে প্রসাদ গুণ, না হবে রসাল,
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"

সুতরাং দৈব শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার পড়াশুনা বিস্তর ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই যথেষ্ট। আর অন্নদাদেবী যে বলিয়াছেন, তাঁহার কৃপার সাক্ষী আছে, সে কথাও যথার্থ; তাঁহার অমৃতান্নের বলে অন্নদামঙ্গলে কথায় কথায় খৈ ফুটিতেছে। যে সংস্কৃত ছন্দগুলি বাঙ্গালায় আনা যাইতে পারে, বাক্য-রসরাজ সেগুলি তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। ভারত, পুরাণ, তন্ত্র হইতে সৃষ্টি-বিবরণ দেখাইতেছেন, কাশীখণ্ড হইতে অন্নপূর্ণার অন্নদানের চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত শুনাইতেছেন,—পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, মৎস্য-মক্ষী-দংশ,

অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতির সুদীর্ঘ তালিকা দিতেছেন। অযোধ্যা বর্ণনা করিতেছেন, দিল্লী, বর্দ্ধমান, যশোহর বর্ণনা করিতেছেন,—গঙ্গার মাহাত্ম্য, জগন্নাথের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। বার মাস, বাহান্ন পীঠ, অষ্ট নায়িকা প্রভৃতি বর্ণন করিতেছেন। এত বৈচিত্র্য কিসের? কথার—ভারত কথায় হীরার ধার। তিনি বাগ্‌বিশারদ। শব্দ-সমুদ্রের মন্থনদণ্ড তাঁহার নিজহস্তে। বাগ্‌যুদ্ধে বঙ্গীয় সকল কবিকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হয়। কখনই তাঁহার মুখের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী টেঁকিতে পারে না—পড়সী কাছে থাকিতে পারে না।

হীরার দাঁত ছোলা ইত্যাদি অঙ্গ-পরিষ্কৃতির লক্ষণ মাত্র। ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্য সকলে পরিষ্কৃতি প্রসিদ্ধ। ভাষা পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত, ছন্দ পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত, রচনা পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত।

এক্ষণে মালিনী-স্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। মনে করুন,—মালিনী সেই হীরা মালিনী, মাজা মচ্‌কান', মাজা দোলান', কিন্‌ ফিনে শাদা ধুতিখানি পরা, চুলটি রজের গোষ্ঠের ভাবে বাঁধা, কোমরের কাছে ছোট ফুলের চুপড়িটি, পান মুখে একটু হাসি, সুন্দরের সম্মুখে বকুল-তলে গিয়া দেখা দিল। সুন্দরের সহিত পরিচয় হইল। সুন্দর মাসী বলিয়া হীরাকে সম্বোধন করিলেন; সম্বোধন করিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আপাদমস্তক পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। সুন্দর মাসী বলিয়া, ভক্তির ভাষায়, গৌরব-বাক্যে হীরাকে সম্বোধন করিয়াছেন। হীরাকে দেখিতে পারিলেন না। মাসী বলিলে তাহার দিকে আর পূরা নজরে চাওয়া যায় না। আমাদের কবি ভারতও তাই। প্রথমত কাব্য-ভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান, আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা। হীরার সেই মাজাদোলা, আর ভারতের নাচনি ছন্দ।

হীরার সেই সুচিক্কণ পরিষ্কৃত দন্ত, আর কাব্যের সেই মার্জ্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচ্‌কে মধুর হাসি, আর ভারতের সেই সহজ প্রসাদ গুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে।

কিন্তু আমরা আর এক কথা বলিতে ছিলাম যে, মাসী বলিলে আর হীরার দিকে পুরা নজরে চাওয়া যায় না,—অন্নদামঙ্গল ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ বলিলেও অপাঠ্য হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন—"আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।" তাহাতেই ভারতচন্দ্র তাঁহার মহিমা প্রকাশ-জন্য, তাঁহার পূজা জগতে প্রচার করিবার জন্য অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এই আজ্ঞা অন্নপূর্ণা না দিয়া, যদি অন্য কোন দেবতা আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলেই উচিত হইত। আমাদের সকল ভাবেরই দেবতা আছে। কিন্তু তাহা হয় নাই; অন্নদামঙ্গল—কাশীশ্বরী অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার পূজা যাহাতে প্রচার হয় এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়। ইহা মনে পড়িলে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর-লীলা অপাঠ্য হইয়া পড়ে। কেবল তন্ত্রোপাসকেরাই এইরূপ রসভেদ একত্র সংস্থান করিতে পারেন, আর কেবল হীরা মালিনীই বোন্‌পোর দৌত্যে অভিনিযুক্তা হইতে পারে।

মালিনী যখন প্রথমে সুন্দরকে আপন পরিচয় প্রদান করিল, তখনই তাহার রীতিনীতি বেশ বোঝা গেল।

মালিনী বলিতেছে,—

"এস যাদু আমার বাড়ী
আমি দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ ও ধন
পূর্ণ হবে মন আশা॥

আমার নাম হীরা মালিনী,
কড়ে রাঁড়ী নাইক স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
(করি) রাজবাড়ীতে যাওয়া আসা ॥”

ইহাতেই সকল কথা বলা হইল। সে নিজে পতিহীনা, অল্পবয়স্কা, তাহাতে বড় ঘরে যাতায়াত আছে, আর সে-বাড়ীর মেয়েরাও যথেষ্ট অনুগ্রহ করে, সুতরাং বুঝে লউন। আবার ভারতেরও ভাব-ভক্তি এক আঁচড়ে বোঝা গিয়াছে। ভারত গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে যে দেবীর পূজা প্রচার-জন্য গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিতেছেন,—

“কিবা সুবলিত উরু, কদলী-কাণ্ডের গুরু,
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস, দশদিশ পরকাশ,
ত্রিভুবন-মোহন-কারিণী ॥

কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধা-সরোবর,
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে,
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥”

দেখুন, এ মালিনী-সভাবাপন্ন গ্রন্থকারের কি আশ্চর্য্য রুচি ও প্রবৃত্তি। জগতের পালনকর্ত্রী, জগজ্জনে অন্নদাত্রী কারণ-অমৃত বিতরণ করিয়া, দেবাদিদেব মহেশ্বরকে অমৃতপানে উন্মত্ত করিয়া, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য সকলকে অন্নদানে পরিপোষণ ও পরিতোষণ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন

না,—কিন্তু তাঁহার নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী, আর তাহাতে যে নিরুপম বাস শোভা করিতেছে, তাহাতেই ত্রিভুবন-মোহন-কারিণী !!!

কি বিচিত্রা রুচি ! আবার ইহার উপর যদি তাঁহার "দশদিশ পরকাশ" বাক্যে কিছু শ্লেষ থাকে, তবে তাঁহাকে আর তাঁহার মালিনীকে একত্র "উভে উভ দিব শূলে" না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এমন কদর্য্য-স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া-মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়া-মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকগুলি উল্লেখ করিয়া ভারতে ও মালিনীতে তুলনা করিয়াছি, আরও গুটিকত দেখাইতেছি।

ভারতচন্দ্রের মালিনী—"কথা কয় ছলে।" স্বয়ং ভারতচন্দ্রও কথা কন ছলে। এটি কিছু কবির বিশেষ গুণের মধ্যে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশে এই ছল কথা কবিতার জীবনী-শক্তি। মুন্‌সীয়ানা দেখিল ত বাঙ্গালি অমনি গলিয়া গেল। ভারতচন্দ্র এই মুন্‌সীগিরির খোষনবীশ। ভারতের মুন্‌সীগিরির সবিস্তার পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই। তাঁহার দক্ষমুখে শিবনিন্দা, অন্নদামুখে ভবানীর পাটুনীকে পরিচয় দান, মালিনীমুখে বিদ্যার রূপ-বর্ণন, আর নিজমুখে চোর-পঞ্চাশতী টীকা প্রভৃতিতে তাঁহার ছল কথার পরিচয় দিতেছে এবং তাঁহার পঞ্চাশাক্ষরা স্তবে, বেসাতির হিসাবে তোটক-তূণক-ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতিতে তাঁহার শব্দ-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

ভারতকাব্য-প্রবলতার আর একটি কারণ আছে। ভারত তাঁহার মালিনীর ন্যায় "ফুলের চুপ্‌ড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।" মনে করুন দেখি, "চাই বেলফুল" বলিলে কত লোক সেই দিকে যায়; দু'পয়সায় কি চার পয়সায় এক ছড়া গ'ড়ে,—কেমন শুভ্র, সুগন্ধ, কোমল ও রমণীয়!

কাল সে মালার কি দশা হ'বে, কোন কাজে লাগিবে কি না, তাহা কেহ তখন ভাবে না। আর যদি কেহ, "ভাল কেতাব চাই", "ভাল কেতাব চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া মরে, তবে বলুন দেখি কয়জন তাহার দিকে যায়; বড় জোর আজকাল বৎসরের প্রথম দিন, না হয় একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "কেমন হে হকার, বলি হাপ্ পাঁজি আছে?" যদি সে বলিল "না," তবেই তাহার সহিত সম্পর্ক ফুরাইল।

কিন্তু ভারত ফুল-ব্যবসায়ী,—তাঁহার খরিদ্দারও অনেক ও নানারঙ্গী। ভারতকে ফুল-ব্যবসায়ী কেন বলি?—তিনি ক্ষণস্থায়ী রস-ব্যবসায়ী। তিনি এই ফুলের চুপ্‌ড়ি লইয়া এই বঙ্গরাজ্যে কাহার বাড়ী না গিয়াছেন? প্রথমে রাজবাড়ী ফুল যোগাইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সকল গৃহস্থ-বাড়ী পর্য্যটন করিয়া, সোনাগাছি, মেছোবাজার প্রভৃতি স্থানে পসার বিস্তার করিতেছেন। যেখানে দেখিবেন, "চাই বেলফুলের" ডাক অধিক, সেইখানেই দেখিবেন যে, ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোকে ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনই পাঠ করিবে না? উত্তর, —কেন, ভদ্রলোকে কি ফুলের আদর জানে না? না, ফুল-ব্যবসায়ী ভদ্রপল্লীতে থাকে না? তবে কি না, ভদ্রলোকে যদি মালিনী-গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন বা কবি ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত কবি জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না; বরং কখন কখনও তাহাতেই তাঁহাদের স্বভাব-দোষ অনুমেয় হইয়া উঠে।

এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মালিনীর ন্যায় কতকগুলি ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র জানেন,—সেগুলিও তাঁহার সুখ্যাতি-বিস্তারের কারণ বলিতে হইবে। সুদীর্ঘ বর্ণনে ভারতচন্দ্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই

বটে, কিন্তু ছিটা-ফোঁটার মত তাঁহার দু'একটি গান অতি মনোহর। ভাল সামগ্রীর সমাদর থাকাই শ্রেয়ঃ ; আমরা ভাল বস্তুর বিশেষ সমাদর করি, তাহাতেই তাঁহার দুইটি গান এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

(রাগ—বসন্ত)

"কাল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে ;
বসন্ত-রাজা আনি ছয় রাগিণী-রাণী,
করিল রাজধানী অশোকমূলে ;
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুণ গুণ,
মদন দিল গুণ ধনুক-হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন,
মধু-মুদিত মন ভারত ভুলে॥"

সুন্দরের পুরপ্রবেশ

"ওহে বিনোদরায় ধীরি ধীরি যাও হে,
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে।
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন-চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর ;
মুখ-সুধাকরে হাসি সুধায় বাঁচাও হে।

নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে ;
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও ?
ভরত যেমন চাহে সেই মত চাও হে।"

এরূপ মধু-মন্ত্র-গানে সকলেই মোহিত হয়। ভরত এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে,
তরতর থরথর ঝরঝর বাতে,
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী-কোলে,
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।"

এ সকল যাদুমন্ত্র-বিশেষ বলিলেই হয়। একটি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র দেখুন,—

"নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা
শীতল মন্দ পবন।"

স্বভাবের কি অপরূপ চিত্র! এমন সব ছিটে-ফোটায় বাঙ্গালি বশ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

আর একটি,—

"তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন, মাতালে নাচায়ো না,
ওহে পরাণ বঁধু বাই, গীত গায়ো না।"

কোন্ ভাব-প্রসঙ্গে শরীর-মধ্যে যে শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ চালিত হইতে থাকে, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই এ মন্ত্র

মহৌষধের বল বুঝিতে পারিবেন। এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। মালিনী ও ভারত উভয় পক্ষেই বলা যায় যে,—

"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া—তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র জানে কতগুলি,
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।"

এখনও ভারত-সমাদরের কিঞ্চিৎ থাকুক, তাহাতেও আপত্তি নাই এবং ভারত ও তাঁহার মালিনী এখনও চেঙ্গড়া ভুলাইয়া খাইতে থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে, তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়; আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী-স্বভাবাপন্ন কবি-যোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বৈশাখ, ১২৮০] [বঙ্গদর্শন—২য় খণ্ড

৮

নব মাথুর সংবাদ

রাজা হ'ল শ্যামরায়, পড়ি গেল সাড়া,
মথুরায় মহা গণ্ডগোল ;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে,
কল্লোলের চারি দিকে উঠিতেছে রোল,
বাজিতেছে শত শত কাড়া।

পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে,
বেণুবীণা বাজিছে সানাই ;
দোকানি পসারি যত সাজাইয়া রাজ-পথ
করে কত বিকি-কিনি নাহিক কামাই ;
মনানন্দে সদানন্দে সবে।

নবরাজ-নবরাজ্যে সকলই নবীন ;
মত্ত সবে নব অনুরাগে ;
"শ্যামরায় জয় জয় !" চারি দিকে ধ্বনি হয়,
পুরাণে ভুলিতে বল কয় দিন লাগে ?
মন হ'তে মুছিবারে চিন্ ?

"যদুরায় শ্যামরায়   সে কেমন জন?"
সকলের মুখে কথা এই;
কেহ বলে, "বটে বীর,"   কেহ বলে, "অতি ধীর,"
কেহ বলে, "রসিকের শিরোমণি সেই,
রাধা-প্রেমে সদাই মগন।

"রাধা রাধা ব'লে সেই   বাজাইত বাঁশী
গোকুলেতে গোপের নন্দন;
চতুরালি জনে জনে,   নাগরালি বৃন্দাবনে
করিয়া করিত সেই দিবস যাপন;
অধরে মধুর তার হাসি।

"হাসি মুখে মিষ্ট কথা,   শিষ্ট ব্যবহার,
চৌদিকে চাহনি তার বটে;
সকলে সন্তোষ করে,   হাসি আসি হাতে ধরে,
লয়ে যায় ধীরে ধীরে যমুনার তটে,—
যেন চির-সখা আপনার।

"যে কথা বলিতে যাও   তাহা ভুলি যাবে,
এমনই কুহকী সেই জন;
তাহার কাহিনী শুনি,   মুগ্ধ হয় যোগি-মুনি,
ব্যথিত—সে ভুলে যায় আপন বেদন;
শত্রু যেও সেও গুণ গাবে।"

রাজা হ'ল শ্যামরায়, পড়ি গেল সাড়া,
যুবতী-মহলে গণ্ডগোল ;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে,
কল্লোলের কল কল উঠিতেছে রোল,
জনরব যায় পাড়া পাড়া।

"সে নাকি চতুর বড় ব্রজের কানাই
কপট লম্পট শঠরাজ,
তপন-তনয়া-তটে, নীপতরু-সুনিকটে,
গোপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ;
আই আই লাজে মরি যাই !

"বৃন্দাবনে রাই-রাজা, সে ছিল কোটাল,
বহু দিন গেছে কোটালিতে ;
মাথায় বাঁধিয়া পাগ্, ডাকিত সে 'জাগ্ জাগ্',
ঘুমাতে দিত না সেই ঘোর রজনীতে ;
বুলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল।

"আই মা গো হইল কি ? রাজ্য কোটালের,
ধন-মান রবে নাহি আর ;
সন্দারি করিবে যেই, ভূপতি হইবে সেই,
কোটালের রাজত্বতে না হয় বিচার,
বিধাতা করিল হেন ফের !"

এত ভাবি যুক্তি ক'রে মিলিয়া সকলে,
কুবজা নুবজা ওঝাইনী,
যত মথুরা-বাসিনী, মরি মধুর-হাসিনী,
রূপ-রস-বয়সের তরুণী কামিনী,
দশ জনে বসিয়া বিরলে,

শ্যামরায়ে ভেটিবারে শলা হ'ল স্থির।
"বুঝিব তাহার নাগরালি,
যাব সবে দলে বলে, বলিব রে ছলে কলে;
চতুরের বুঝা যাবে যত চতুরালি,
কেমন রসিক যদুবীর।

"গোপের নন্দন সেই, নিজে গোপরাজ,
গোপী-সাজে মজিবেক মন;
নাম গোপিনী-রমণ, বুঝে গোপিনীর মন,
গোপনেতে গোপিনীর ব্যথিত সে জন;
গোপী-সাজে ভেটাইব আজ।"

যুকতি যোজনা করি জনে জনে মনে,
গোয়ালিনী সাজে মাথুরিণী;
ডারিল মথুরা-বেশ, খুলিল কবরী-কেশ,
বিজটা ত্রিজটা হার কঙ্কণ কিঙ্কিণী;
দূরে দিল কনক-ভূষণে।

বিনাইল কেশ-বেশ গোয়ালিনী ছাঁদে,
বৃন্দাবনী ঘাঘরি আঁটিল,
মাথায় পসরা-ডালা, সাজিয়া গোপের বালা,
পঞ্চ জনা মাথুরিণী বাহির হইল,
ভেটিবারে সেই শ্যামচাঁদে।

সঙ্গে মথুরা-বাসিনী অনেক নাগরী
চলে মাথুরিণী-বেশে,
সোনা-বুটি নীল শাড়ী, জরদ-চমক-পাড়ি,
গোটাদার পাল্লাদার আঁচরহি শেষে,
তাহে কত আছে কারিগরী।

ঘিরি ফিরি পরিল রে সেই নীল শাড়ী,
বাম পিঠে ঝুলত আঁচল,
কৌতুকে কাঁচুলি আঁটা, পাহাড় বুকের পাটা,
সুমতি কুমতি তায় করে ঝলমল;
চলিল রে দুহু বাহু নাড়ি।

কঙ্কণ বলয় তাড়, চউরঙ্গ চুড়ী
বাহুতে শোভিল বড় রঙ্গে,
শিরেতে সীমন্ত টেড়ি, অরধ গুণ্ঠন বেড়ি,
ঝিউরি বউরি দুহু ভিন্ ভিন্ ঢঙ্গে,
চিকুর কানড় ছাঁদে মুড়ি।

নব মাথুর সংবাদ

থরল নয়ন-ভঙ্গি, গরল মিশালে,
কাজল ডারল তাহে বেরি,
করল মরাল-গতি, বাহিরল রাজপথি,
ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি,
ভয় ভয় চৌদিকে নেহালে।

গোপিনী-বেশিনী যত মথুরা-বাসিনী,
চলিল সবার আগে আগে ;
পাতিয়া বেশের ফাঁদ, ধরিব রে শ্যামচাঁদ,
নব ভূপে মজাইব নব অনুরাগে।
পিছে চলে মথুরা-বেশিনী।

বার দিয়া বসিয়াছে শ্যামচাঁদ রায়,
ভোজরাজ-রত্ন-সিংহাসনে,
নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্তুতি গায়,
চোপ্দার্ দাঁড়াইয়া যুগল-চরণে ;
দিব্যাঙ্গনা চামর ঢুলায় ;

দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ডবৎ,
মথুরা-বাসিনী-আগমন ;
সঙ্কেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দূরে যায়,
"আসতে বলহ" বলি আদেশে তখন ;
দ্বারবান্ ছাড়ি দিল পথ।

পসরা উতারি যত গোপিনী-বেশিনী
গোপী-চাঁদে করে নমস্কার ;
মথুরা-বেশিনী সবে প্রণমিয়া সগৌরবে,
ধীর ভাষে শ্যামচাঁদে দিল জয়কার,
লাজে ভয়ে মধুর-হাসিনী ।

গোয়ালিনী-বেশ হেরি নটবর তাহে,
মুচকি মুচকি থোড়ি হাসে ;
উচিত ভরম ভর, কহিল হি ততঃপর,—
"নগর-বাসিনী ধনি, আগমন কাহে ?
বলয়িবি হামারি সকাশে ।"

আগরি আসিল দূতী একবর নারী,
পরবীণা পরিপক মতি,
বলিল গরজ কথা, জানাল আরজ-ব্যথা,—
"কোটালে বিচার ভার না দেয় ভূপতি,
আপনক মনহি বিচারি ।"

নব ভূপ উত্তরিল বুঝিয়া সন্ধান,—
"ভয় নহি রঙ্গিণী-সমাজে,—
আমি ত কোটাল-রাজ, জান সব ব্রজমাঝ,
নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে ;
পায়ে ধরি বাড়াইতে মান ।"

সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে যদুরায়,
ভূমেতে উরিল জনু চাঁদে ;
গোপিনী-বেশিনী পাশে দাঁড়ায়ে মুচকি হাসে,
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দাবনী ছাঁদে ;
প্রাণ তার উড়ে উভরায়।

"ছি ছি কি কর কি কর শ্যাম নটবর,
মরি মরি মরি হরি লাজে !
গোপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দাবনী নটী,
মথুরায় বসন-হরণ নাহি সাজে ;
ছাড় ছাড়, যাই সবে ঘর।"

বুঝিল চতুর রায় ভীতা বিদেশিনী :
আশ্বাসি বিশ্বাস দেয় তায় ;
বলে, "নহি নহি সখি, কাহে তুহ থকমকি ?
রাজা হাম ঐসা কাম, কভি না জুয়ায় ;
কাহে তু রে সাজি গোয়ালিনী ?

"নগর-বাসিনী তুহ নাগরী কামিনী,
কাঁচরি আঁচরি তোরা সাজ ;
তেয়াগিয়া রাজ-বেশ, কাহে তু ধরল শেষ,—
আভিরী ঘাঘরি পরি গোপী-বেশ আজ,—
কাহে তুহ সাজ গোয়ালিনী ?

"হেরত মাথুরী বেশ মর্য্যাদা মাধুরী,
চমক জমক হের কৈসা!
আঁধার রাতমে জনু নীল নভবর-তনু
লচ্ছ লচ্ছ হি নচ্ছত্রে চমকতি বৈসা,
উজ্জ্বরা সুন্দর শান্ত ভূরি।

"পাটরাণী-বেশ ছোড়ি কাঠুরাণী-সাজ,
ছিক্ ছি বিষম মতি-ভুল!
কাঞ্চনে আদর নহি, কাঁহা কাচ চুঁরতহি,
হাতের কমল ফেলি, লম্ববি সিমুল?
ইহ নহ চতুরিক কাজ।"

প্রবীণা পলিতকেশী দূতী-আগুয়ান,
বুড়ি কর করে নিবেদন, —
"যত দেখি গোপরায় গোপিনীর বেশ চায়,
সেই লাগি পরিয়াছি গোপিনী-বসন;
ভূপ তাহে নাহি ভাব আন।"

"আনক গোপক হাম না জানি বিচারি,
কাকর মনমে কিয়া হায়;
হাম তু গোপল বটি, পহিরহি পীঠখটি,
আভিরী ঘাঘরি কিন্তু হামে নাহি ভায়,
ভলিবনি মাথুরিণী শারী।

"হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে"—
কহিল মুচকি হাসি শ্যামে ;
কুবজা কোণেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল,
সসম্ভ্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে ;
আপনি বসিল পরে তাতে।

"জয় জয় শ্যামরায়!" পূরিল অবনী ;
মাথুরীতে মজিল কানাই।
'দ্বাপরে ঘটিল যাহা, কলিতে হইবে তাহা,'—
আচম্বিতে দৈববাণী শুনিল সবাই।
হরি হরি কর হরিধ্বনি।*

মাঘ, ১২৯১] [নবজীবন—১ম ভাগ

---

* ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে আনন্দমোহন বসু-প্রমুখ কয়েক জন সভ্য লর্ড ডফ্‌রিণের নিকটে 'ডেপুটেশনে' গিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জন সভ্য সাহেবী পোষাকে লাটের সম্মুখে উপস্থিত হন। শুনা যায়, লাট সাহেব তাঁহাদের এই সাহেবী পোষাক লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ পোষাক পরিধান করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেশীয় পোষাক পরিধান করেন নাই বলিয়া রহস্যচ্ছলে তাঁহাদিগকে বিশেষ লজ্জিত করিয়াছিলেন।

৯

তালতলার চটি

রে তালতলার চটি ! ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না ! ইংরাজ বটবিটপীর সহিত শাখোটক * সমান করিয়া তুলিয়াছেন কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কানফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন কেবল রে চটি ! তোর দুরদৃষ্টক্রমে, বুট-চটি এক ভাবে দেখিতে পারিলেন না। ইংরাজ বিচার কার্য্যের সাহায্য-জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন আনিয়া তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুল্‌জার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন। ইংরাজের চক্ষুতে উচ্চনীচ নাই ; কেবল রে চর্ম্মচটি ! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাদুর বস্ত্রপরিষ্কারককে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়াছেন ধীবর মৎস্যজীবীকে ধীমান্ বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন পীরবক্স খাঁকে রায়বাহাদুর করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগা তালতলার চটি ! এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না।

চটি তুই আপনার কর্ম্মদোষে আপনি মারা গেলি ; এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না ! তুই আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি, একথা কেন বলি ? তবে শোন্,—মহামুনি রব্‌রায়, শ্রীমান্

---

* শ্যাওড়াগাছ।

মেকলে, আচার্য্যবর ডাক্তার ডফ্, পাদরি মনক্রীফ্ উড, অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন অতি বদান্য জর্জ কাম্বেল প্রভৃতি মহাত্মা লোক অপেক্ষা স্কট্‌লণ্ডবাসী সাধারণ লোক যত নীচ, আর সেই সাধারণ স্কট্‌লণ্ডীয় হইতে ইংলণ্ডীয়েরা তত নীচ। সেই ইংলণ্ডীয় অপেক্ষা ইটালীয়েরা আবার সেই পরিমাণে নীচ; ইটালীয় হইতে হিন্দুমাত্রই ততোধিক নীচ; সেই হিন্দুর অপকৃষ্ট বাঙ্গালি, যে নীচস্য নীচ,—তুই কিনা ইংরাজের মস্তক থাকিতে, স্কট্‌লণ্ডীয়ের বিশাল বক্ষঃ থাকিতে, ইটালীয়ের সুন্দর দেহ থাকিতে—এত জাতির এত অবয়ব থাকিতে, তুই কিনা চটি! সেই নীচস্য নীচ বাঙ্গালির পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলি? তোর দুর্দ্দশা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তাহাতেই বলি, চটি তুই আপনি আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি! তোকে যে সকল মহৎ স্থান দেখাইয়া দিলাম, যদি এত দিন সেই সকল স্থানে বিশ্রামের উদ্যোগ করিতিস্, তাহা হইলে এত দিন তোর গৌরব, তোর গুণ, সাটর্ডে রিবিউ সংহিতা * পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইত। সেরূপ উন্নতির উদ্যোগ করা দূরে থাকুক, তুই কিনা সেই নীচস্য নীচ বাঙ্গালি জাতির মধ্যে যে কুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাহারই কাটা পায়ের আশ্রয় লইয়া, মহামন্ত্রপূত ইংরাজের যাদুগৃহে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিস্? তালতলা-সম্ভূতার এত দূর স্পর্দ্ধা! মৌচিকালয়ের নিভৃতার্দ্র প্রদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপর্য্যুপরি থাকিয়া লর্ড মেকলের তপস্যা করিতে পারিস্—করিয়া লালবাজারে জন্মগ্রহণ করত পেণ্ট্‌লনধারী কোন কেরাণীর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে পারিস্, তবে এরূপ স্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করিস্। তোর এ জন্মে, এ চর্ম্মচটি-জন্মে, কুসন্তান

* বিলাতের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র।

বিদ্যাসাগরের বলে তুই এ স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবি না। বোধ হয়, তুই কখন মহর্ষি ডার্বিনের তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিস্ নাই—মেট্‌কাফ্-ভবনে * যাইতে পারিবি না, সে তন্ত্র দেখিতে পাইবি কোথা হইতে? যদি তোর ডার্বিন-তন্ত্র পড়া থাকিত, ত বুঝিতে পারিতিস্ যে, পার্ক ষ্ট্রীটের শ্রীমন্দির + রাজপুরুষগণের পিতৃপুরুষদিগের সমাধিশালা। ইহাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের, ভ্রাতৃবর্গের, কুটুম্ব-সজ্জনের পবিত্র অস্থি সঞ্চিত থাকে। ইহার জন্য পূজারি, পুরোহিত, পরিষ্কারক, প্রযাজক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে; ইহার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে নূতন সমাজ-মন্দির গঠিত হইতেছে—তবে কলঙ্কিনী, তালতলা-সম্ভূতা অপকৃষ্ট জুতা, বিদ্যাসাগর-পদাশ্রিতা! তোর কেন এ স্পর্দ্ধা!!! দূরীভব! ‡

২৯ আষাঢ়, ১২৮১] [সাধারণী—২ ভাগ, ১৩ সংখ্যা

* Metcalf Hall

+ Museum

‡ বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল সময় তালতলার চটি ব্যবহার করিতেন। সেই চটি পায়ে দিয়া তিনি এক দিন যাদুঘরে (Museum) গিয়াছিলেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এই ঘটনা লইয়া সংবাদ-পত্রে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল।

নবজীবনের আট্‌কৌড়ে

আট দিনে আট্‌কৌড়ে আছে পূর্ব্বাপরে,
নবজীবনের আট্‌কৌড়ে হ'ল সম্বৎসরে।
আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল ?
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে চাল'।

বাপে গালি দিয়া করে ছেলের আশীর্ব্বাদ,
আত্মবন্ধুর যোগার করে যা'র যত বাদ।
চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর,
কুলো বাজায়ে ফেলে দেয় আঁতুড় ঘরের পার।
এমন উৎসব আর কোন দেশে নাই,
গালি দিলে আশীর্ব্বাদ এই দেশে ভাই।
তবে, যাও লেগে তেগে তেগে যে যেখানে আছ—
বাজাও কুলো ছড়াও ধূলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ';
গালাগালি চূনকালি কর মনের আশে,
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ঠাঁযে।

নবজীবনের আট্‌কৌড়ে প'ড়ে গেল ধূম,
চারি দিকে কুলো বাজে ধুড়ুম ধুড়ুম।
হুলস্থূল তোল্‌পাড় হয় বঙ্গভূম,
সেই রবে ভেঙ্গে যায় কুম্ভকর্ণ-ঘুম।

অঙ্গে বঙ্গে রঙ্গে ঢঙ্গে নানা রূপে আজি
বাহিরিল শত্রুমিত্র নানা বেশে সাজি।
নেংটা পরী কন্ধে লয়ে রুচির বাহার দিয়ে,
অঙ্গনেতে সঞ্জীবনী (১) এল সঙ্গী নিয়ে ;
এম,এ, বি,এল এল কত উড়ায়ে পতাকা, (২)
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আছে আঁকা।
সঙ্গে তা'র শাস্ত্রী (৩) মিস্ত্রী (৪) ইস্ত্রী কারিগর,
সাম্য ভাবে কাম্য-লাভে সব ধনুর্দ্ধর।
কাঁসাই ভাসায়ে এল নবীনা মেদিনী (৫)
ভারত (৬) করেছে মাটি, তবু তেজস্বিনী ;
বিদ্যাভূষণ (৭) ভট্টাচার্য্য (৮) আসি উপস্থিত,
অষ্ট কপর্দ্দীর স্মৃতি প্রমাণ-সহিত।

---

(১) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র-সম্পাদিত সাপ্তাহিত পত্রিকা।
(২) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম,এ, বি,এল,-সম্পাদিত পত্রিকা।
(৩) শিবনাথ শাস্ত্রী।
(৪) বরদাপ্রসাদ ঘোষ। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করিতেন।
(৫) মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত 'নবমেদিনী' পত্রিকা।
(৬) 'ভারতবাসী' পত্রিকা।
(৭) 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
(৮) 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সুরভি * আইল নূতন সুরভি-সঞ্চারে.
নীল পাড় লাগায়েছে গরবের ভরে।
সস্তাদরে কস্তাপেড়ে লম্বা কোঁচা দোল,
'এত সস্তা আর নাই' ফুকরত বোল।
হাট্‌ পাড়ি হামাগুড়ি এল ভারতবাসী,
তেই তেই থেই থেই গালি দেয় হাসি।
পাদমূলে বসি কেহ শিক্ষা ল'তে গিয়া
গুরু গালি দিল এবে গুরুকে লইয়া।
শিক্ষা বটে দীক্ষা বটে কলির ব্যাভার,
আট্‌কৌড়ে দিনে কাণ্ডজ্ঞান নাহি আর।
গলা উঠে মুখ ছুটে লাজ টুটে এবে,
মন যেবা গালি দিবা ডর কিবা তবে।

তবে, যাও লেগে তেগে তেগে যে যেখানে আছ,
বাজাও কুলো ছড়াও ধুলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ';
গালাগালি ঢলাঢলি কর' মনের হাসে,
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ভাষে।

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল?
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে চাল'।

* যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-সম্পাদিত 'সুরভি' পত্রিকা। ইনি 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র নহেন।

নাহি বোধ মানামান, কেবল অসত্য প্রাণ,
নিতান্ত নীচার্থ লঘুচিত্ত ;
ভাষাকে সাজায়ে সাজে, অলঙ্কারে, ঘষে মাজে,
এ সব লেখক বেশ্যাবৃত্ত। *

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে (নব) জীবন ভাল ?
পাঠকদের প্রাণ জুড়ায়ে
লেখকদের উপর ঢাল'।

নবজীবন-সম্পাদক, রাধাকৃষ্ণ-উপাসক,
খেলে সেই সুচতুর খেলা,
হিন্দু-ধর্ম্ম-উত্থাপক, বিষ্ণু-ধর্ম্ম-প্রচারক,
কণিক্‌-ম্যাকিয়াবেলি-চেলা। †

---

* "কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে এইরূপ কুলটাবৃত্ত, লঘুচিত্ত, আত্মসম্মান-বোধহীন লেখকগণেরই আদর ও প্রতি-পত্তি বেশী।"

প্রতিবাদ—নবজীবন-সম্পাদক ও বিধবা-বিবাহ। "আলোচনা"-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

† "আর একটি বিষয়ে অক্ষয়বাবুকে কন্‌গ্রাচুলেট করিতে ইচ্ছা হয়। সেটি অক্ষয়বাবুর সূক্ষ্মদর্শিনী, কণিক্‌-ম্যাকিয়াবেলি-পদানুসারিণী বুদ্ধি। * * * * নবজীবন-সম্পাদক বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক, আদর্শ নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণের উপাসক, হিন্দুধর্ম্মের উত্থাপক মহাশয় যে অতি সুচতুর লোক, [illegible] বলিলেও চলে।" ঐ ঐ ঐ

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে (নব) জীবন ভাল ?
পাঠকদের কোল জুড়ায়ে সম্পাদকে ঢাল'।
এই ত হিন্দু-সমাজ, এই পরিবার-মাঝ,
পূতিগন্ধময়ী নারী—তাকি তুমি জান না ?
কেবল ভাষার চোটে, কেবল কথার জোটে,
পসার জাঁকাবে বলি, সত্য কথা মান না। *

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে (নব) জীবন ভাল ?
সম্পাদকে গালি দিয়া মনের দুঃখ ঢাল'।
চিরকাল গেল বয়ে,
এবে যারা প্রৌঢ়-বয়ে,
অনুবাদকেরে সাথী করি,
পড়ে মনুসংহিতা,
অথবা ভগবদ্গীতা,
তারা ধর্ম্ম-প্রচারক ! মরি !

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে ভাল আছে ?
প্রচারকে গালি দিয়া ভারতবাসী নাচে।

"এ কথা যিনি বলেন, তিনি হয় সাধারণ হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-পরিবারের কথা কিছুই জানেন না, অথবা জানিয়া শুনিয়া ভাষার চোটে, কল্পনার তরঙ্গে, পসার জাঁকানর লোভে সত্যের অপলাপ করেন। * * * (হিন্দু) রমণীগণ সর্ব্বপ্রকার পূতি[illegible] হইতে মুক্ত থাকিয়া, নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছে, অসম্ভব কথা প্রচার করা কেমন করিয়া, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" ঐ[illegible]

পুণ্যভূমি বারাণসী, অন্নসত্রে অন্নরাশি
ধ্বংস করি অঙ্গপুষ্ট যাঁ'র,
গৈরিক বসন পরি, মুখে বলি শিব-হরি,
সেই করে ধর্ম্মের প্রচার।*

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে দেখাও আন' ;
সকলকে ছেড়ে দিয়ে চূড়ামণিকে † টান'।
নাহি কিছু সৎসাহস, নৈতিক ভীরুতাবশ,
জনগত স্বতন্ত্রতা নাই,
ঘোর আত্মম্ভরী তায়, শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়,
সংক্ষেপে কেবল বালাই।‡

* "আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক * * * সম্ভবতঃ প্রৌঢ় বয়সে কো অনুবাদকের সাহায্যে কিয়দংশ মনুসংহিতা বা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়াছেন, নতুবা পুণ্যভূমি বারাণসীর অন্নসত্রে কিয়ৎকাল দেহ পুষ্ট হইয়া গৈরিক বসন পরিধান-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী হইয়াছেন।" —ভারতবাসী, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

† শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।

‡ "সৎসাহসের পরিবর্ত্তে নৈতিক ভীরুতা, জনবিশেষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পরিবর্ত্তে ঘোর আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি বিশেষ দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে।"—নবমেদিনী। প্রবন্ধ—'তুমি না শিক্ষিত যুবক?'

নবজীবনের আট্‌কৌড়ে

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে আপ্তসার কর,
নবজীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর।
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তব মুখে অত্যাশ্চর্য্য,
তুমি না শিক্ষিত? হা ধিক্!
ধিক্ তব শিক্ষায়, ধিক্ তব দীক্ষায়,
জীবনেতে ধিক্ ততোধিক।*

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাঁট',
নবজীবনের দায়ে এবার শিক্ষিতেরে কাট'।
আপনারা ভোগ-সুখে থাক দেখি মুখে মুখে,
বিধবায় বল ব্রহ্মচর্য্য।
লঘুচেতা স্বার্থপর, কাপুরুষ পামর,
এই তব শিক্ষা-পারম্পর্য্য?†

---

* "* * * বিধবা বালিকার বিবাহ দেওয়া অন্যায়, তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেও বলিয়া চীৎকার করেন, স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া বুক ফুলাইয়া চলেন, আপনাকে অতি সুশিক্ষিত লোক বলিয়া মনে করেন। ধিক্ ইহাদের শিক্ষা, ধিক্ ইহাদের জীবন।" ঐ ঐ ঐ

† "বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এক শ্রেণীর হৃদয়বিহীন, লঘুচেতা, স্বার্থপর, কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা সেইরূপ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখী হিন্দুবিধবাদিগকে উপদেশ দিতেছে, 'তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর, ব্রহ্মচর্য্যের সমান গুণ নাই'।"
—পতাকা, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে নবজীবন আন',
এক জনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনকে টান'।
শকুন্তলা অভিজ্ঞান, জয়দেব গীতিগান
পড়ি কর' শাস্ত্রের বিচার ;
স্বর্গের দেবতাগণ পাদক্ষেপে কুণ্ঠ হন,
নির্ব্বোধের সেথা অধিকার !*

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল ?
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে,
ছেলের বাপের মুখে চাল'।
ভ্রূণহত্যা পাপকর্ম্ম, বঙ্গে সনাতন ধর্ম্ম,—
ব্যাখ্যা পুন হইবে সভায়,
সুকুলীন-বংশজাত, এম, এ, উপাধিগত,
সভাপতি থাকিবেন তায়।

আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে তুল ঘর,
লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর।
গদ্যে পদ্যে কুলোর বাদ্যে বাঙ্গালা হুলস্থূল,
বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়ের হয় যেন ভুল।

---

* "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, উত্তররাম-চরিত, জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা। * * * কিন্তু ইংরাজী কথায় বলে, যেথা[illegible] স্বর্গের দেবতাগণ পাদক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন, নির্ব্বোধেরা সবেগে সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হয়।"
—সোমপ্রকাশ, ২০শে [illegible] ১২৯২।

সম্পাদক লেখকের প্রচারকের আর,
ক্রমেতে হইল এবে ত্রিকুল উদ্ধার !

শেষে বঙ্গবিধবার হইল খোয়ার,
প্রমাণ হ'ল ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার।

শতেকে নিরানব্বই বিধবা অসতী,
চীৎকারে বলিল বঙ্গে 'শ্রীপূঃ' * মহামতি।

দেবানন্দ শান্তিপুর নাম মাত্র সার,
সাব্যস্ত—সমস্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার।

শেষেতে সিদ্ধান্ত হ'ল মিলি বিচক্ষণ,
বঙ্গদেশে সুজাতক নাহি এক জন।

সুসিদ্ধান্ত, তবু ক্ষান্ত নহে গণ্ডগোল,
আট্‌কৌড়ে বাট্‌কৌড়ে চারি দিকে রোল।

কবি কহে, 'না মিটিবে মিঠাই না পেলে',—
গিন্নী বলে, 'এই লও, হাতে হাতে পেলে।

তোমাদের গালাগালি—আমাদের বর,
আশীর্ব্বাদ করি, এবে সবে যাও ঘর।

ঘরে গিয়া গালাগালি কর মনের আশে,
আহ্লাদে হাসিব সবে জল্লাদের ভাষে।
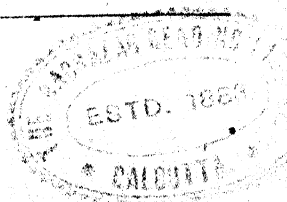
---

* "কাব্যসুন্দরী"-প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু।

এবার পেলে অল্প স্বল্প ভালমুখে যাও,
ষষ্ঠীপূজায় দিব খই—বাকি যাহা চাও।*

আষাঢ়, ১২৯২] [নবজীবন—১ম ভাগ

---

* নবজীবনের প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংখ্যায় "বর্ষশেষে দুই একটি কথা"র মধ্যে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"........লেখক-পাঠকের মর্য্যাদায় আজি আমরা অকিঞ্চন হইয়াও মর্য্যাদাবান্। এত আহ্লাদের কথায় একটু বিষাদের কথা আছে। জন কত লোক সূতিকা হইতেই আমাদের উপর বিরূপ। ইঁহারা কথায় কথায় আমাদের উপর সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে যত্নবান্। আমরা উত্তরে মুখ ফিরাইলে বলেন,—এই চলিল তিব্বতে, ইহারা এবার থিয়সফিষ্ট হইবে; পূর্ব্বমুখ হইলে বলেন,—ঐ দেখ বুড়া ঋষিগণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে; পশ্চিম মুখে ফিরিলে বলেন,—এইবার ইহারা মক্কায় গিয়া ফতোয়া পড়িবে; দক্ষিণমুখ হইলে বলেন,— যাক্ এইবার ইহারা যমালয়ে গেল।

এরূপে অঙ্কুশ-ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের উপর যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদের [illegible] ট আমাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি; কেন না, সেই দীর্ঘ জীবনই কেবল তাঁহাদের [illegible]র্থক আশঙ্কা তিরোহিত করিতে পারে। ভগবানের ভরসায় তাঁহাদের শাপে আমি [illegible]র হইবে।"

১১

তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা অনার্য্য

আমরা বড় পিট্‌পিটে জাতি, তোমরা দিল্‌দরিয়া। আমাদের কাছে লাখো বিচার,—জাতি-বিচার, খাদ্য-বিচার, সম্পর্ক-বিচার, স্থান-বিচার, কাল-বিচার, স্ত্রী-পুরুষ-বিচার, সধবা-বিধবা-বিচার—লাখো বিচার। তোমাদের কাছে কোন বালাই নাই। পেলেই হইল। তা'র স্থান নাই, কাল নাই, জাতি নাই, সম্পর্ক নাই, সধবা-বিধবা নাই,—পেলেই হইল, আর হইলেই হইল,—অবারিত দ্বার, অকবাটিত ঘর। খোলা মন, ঢালা বিধি ; অদ্বার পন্থা, উদার পদ্ধতি।

প্রথমেই দেখ কি বিষম গোল। আমরা বলি,—ঋষি, মুনি, মনু, দেবতা প্রভৃতি হইতে আমাদের উৎপত্তি। তোমরা আপনারা বুঝিতেছ, সকলকে বুঝাইবার চেষ্টায় আছ যে, কীটাণু-কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে রাক্ষস-বানর হইতে তোমাদের উৎপত্তি। ধরিয়া লইলাম যে, প্রমাণ দুই দিকেই সমান। কোন্‌টা সঙ্গত, কোন্‌টা অসঙ্গত সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয় দিবার সময় উভয় জাতির কিরূপ [illegible]-ভেদ! গোড়াতেই যখন এত গণ্ডগোল, তখন তোমায় আমায় [illegible]ন্বিতা নাই, তাহা তুমি আর একবার করিয়া বলিতেছ ?

আমাদের বাড়ী ঘর দেখ, তাহাতে বিচার। কতকটা তা'র অন্তর্বাটী, কতকটা বহির্বাটী, আবার কতকটা ঠাকুরবাটী। তোমাদের এত সেত কারসাজি নাই,—একটা ঘর—ড্রইংরুম। তাহার এক দিকে কুঁড়ে কেদারায় অর্দ্ধশয়ানা হইয়া বুক্কাটা ঘাঘরা পরিয়া মেম সাহেব জুতা বুনিতেছেন, অন্য দিকে নেলি নভেল পাঠ করিতেছে,—পুষি তাহার ক্রোড়ে; সাহেব গভর্মেণ্টের কড়া চিঠির উত্তর লিখিতেছেন। আর সকলের মাঝখানে সারমেয় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে এক দিকের দন্ত বিকাশ করিয়া লেলিহান জিহ্বায় পড়িয়া আছে। কুক্কুর, বিড়াল, নর, নারীর এরূপ সম পদবীতে সংস্থান আমরা কখনই করিয়া উঠিতে পারিব না। তাহাতেই ত স্পষ্ট কথা বলিতেছি, তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা আর্য্য নহি।

খাদ্যের কথাই ধর'। আমাদের—হিন্দুদের মহা পিট্‌পিটানি। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খাইতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন মাসে, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বালকে একরূপ, যুবায় একরূপ, বৃদ্ধে অন্যরূপ। পুরুষে একরূপ, স্ত্রীতে অন্যরূপ। সধবার একরূপ, বিধবার আর এক প্রকার। প্রতি বাড়ীতে পাঁচটা হেঁসেল, দশ প্রকার রন্ধন, কুড়ি রকম পাক। তোমাদের কিন্তু 'ব্রেড্ এণ্ড বীফ'। বস্, বাঁদি রোশ্‌নাই। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্যতাম্। ছেলেবুড়া, মেয়েমর্দ্দ, বালিকাযুবতী, পাদরীদস্যু,—সব্ সমান। খাদকের হিসাবে খাদ্যের কোন বিচার নাই। খাদ্যের প্রকৃতি ধরিয়াও বিচার নাই। পনীরের কৃমি হইতে আ[illegible] করিয়া তাজি ঘোড়ার টেঙ্গরি—যখন যাহা জুটিবে তাহাতেই প্রস্তুত। [illegible]াহার অর্থে—জঠর-গহ্বর-পূরণ। তা হাড়গোড়, কৃমি-কঙ্কাল[illegible]। কিছু দিয়া হইলেই হইল। তাহাতেই

বলিতেছি, তুমি সর্ব্বভুক্। আমরা পিট্‌পিটে। তুমি আর্য্য হইলে, আমরা আর্য্য নহি।

ধর', জাতির কথা। তোমরা এ সকল কথা কিছু বুঝিবে না, তবু দু'টা কথা বলিতে হইতেছে। আমরা মনে করি, যদি কসায়ের ছেলে পাদরী হয়, তাহা হইলে হয়ত, যীশুখৃষ্ট স্বীয় শিষ্যগণকে রুটি বিভাগ করিয়া দিয়া সেই যে বলিয়াছিলেন,—'ইহা আমার শরীরের অংশ, মাংসখণ্ড জ্ঞান করিবে,'—সে কেবল সেই রক্ত-মাংসের কথাই ভাবে। হয়ত সে প্রভুকে জবাই করিবার জন্যই ব্যগ্র থাকে। তোমরা অবশ্য এ সকল কথা ভাবনা, আমরা সংস্কার-বশে ভাবি। সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাবি যে, তোমাদের দেশের এত কসাই, কামার, চামার, ছুতার এ দেশে যদি রাজপদ পাইয়া আসিতে না পারিত, তাহা হইলে হয়ত আমাদের এখনকার মত জীবন্তে দিবারাত্র জবাই হইতে হইত না,—দিবারাত্র হাতুড়ির ঘায়ে ইস্পাতের পাত হইতে হইত না,—আর বুকের উপর অনবরত দু'মুখো করাতের হড়্‌হড়ানি ঘর্ঘরাণিতে এত জ্বালাযন্ত্রণা, রক্তপাত ও মর্ম্মচ্ছেদ হইত না।

তোমরা বল বিবাহ একটা যোটনা। আমরা বলি, যোটনা-দ্বারা সংস্কারই বিবাহের উদ্দেশ্য। আবার আমাদের সেই যোটনারই বা ঘটা কত! তাহাতে (ক) জাতিবিচার,—স্ত্রীপুরুষ এক জাতি হওয়া চাই। তাহার পর (খ) বয়োবিচার,—পুরুষ নারীর অপেক্ষা বড় হওয়া চাই। তাহার পর (গ) শরীর-বিচার,—নারী অনার্ত্তবা কুমারী হওয়া চাই। (ঘ) গোত্র-বিচার,—এক গোত্র হইলে মিলিবে না। (ঙ) সম্পর্ক-বিচার,—পিতার ও মাতার সপিণ্ডা না হয়। (চ) এমন কি নামের পর্য্যন্ত বিচার,—কন্যার নাম মায়ের নাম হইলে চলিবে না। (ছ) কাল-বিচার,—

তাহার পর (জ) স্থান-বিচার। সর্ব্বশেষ (ঝ) ক্রিয়া। সে এক অদ্ভুত কথা। ভাবী বংশধরগণের প্রাপ্তি-কামনায় আমরা মৃত পুরুষগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া তবে বর্ত্তমানকে গ্রহণ করি। আভ্যুদয়িক, কুশণ্ডিকা, গর্ভাধান—তিনটি কার্য্যে—একটি বিবাহ। সোজা কথায় আমরা বিবাহের জন্য শ্রাদ্ধ করি; এমন বর্ব্বরতায় তোমরা অবশ্য হাসিবে। তোমাদের পক্ষে হাসিবার কথাই বটে। কেন না, বিবাহ আমাদের সংস্কার; তোমাদের কার্‌বার। তোমরা খোঁজ' কারবারের জন্য একজন partner বা অংশীদার; আমরা খুঁজি আমাদের সংস্কারের জন্য একজন সহধর্ম্মিণী। কাজেই তোমাদের বিবাহে আমাদের মত সাতসতের' মারপ্যাঁচ নাই।

বাহান্ন বৎসরের বর্ষীয়সী ত্রিকালীন বিধবা চক্কড়ে যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন,—'এই বয়সে একাকিনী, সংসার কি বিঘোর!' হঠাৎ সম্মুখের গাড়ীর জানালা দিয়া দেখিলেন, ছোক্‌রা গাড়োয়ান গাড়ী চালাইতেছে বেশ! হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া বাহির হইয়া কোচবক্সের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া গাড়োয়ানকে অতি কোমলস্বরে বলিলেন,—'Barky, will you marry me?'—'বার্কি, আমাকে বোটনা করিবি?' বার্কি-চন্দ্র ফিরিয়া চাহিল না,—সে ত আপনার কদর জানে। কিন্তু নিমেষ-মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে একবার একটু তীব্র কশাঘাত করিয়া অমনই বলিল, 'Why not?'—'না করিমু ক্যান্?' বস্, চুক্তি শেষ। পথিপার্শ্বে গির্জ্জার নিকট গাড়ী থামিল। পাদরী উপস্থিত; বৃত্তান্ত অবগত; কার্‌বারের অংশীদারেরা তাঁহার সমক্ষে স্বীকার। মন্ত্র—

কন্যার্থী [illegible] স্বয়ং [illegible] বরযাত্র বর।
[illegible]কন্যারিকা,
আমি দিনু [illegible]াদ, কর গিয়া ঘর॥

প্রথম সংসার। অতুল প্রণয়। সম্বৎসর অতিবাহিত। বাকি বিরক্ত।

ঘরেতে বিবর হ'ল, চলে নাক আর।

অফ্‌কোর্স ডাইভোর্স কথা কি আর তার?

তোমাদের যাতায়াত উভয় দিকেই মঙ্গলাদি সমাচার, আমাদের কেবল আচারে বিচারে প্রাণগতিক ভয় বিশেষ।

তোমাদের উপাসনা—জগদীশ্বরের সমীপে সাম্প্রদায়িক হাফ্‌আক্‌ড়ায়ের গান। মিল, অমিল—যাহারথানা গলায়, উচ্চ স্বরে, একতানে চীৎকার। কথাটা কি? না—রোজ বরাদ্দের রুটি যেন আমরা সকলেই পাই। আমাদের—জনে জনে. নির্জ্জনে. নিভৃতে, নিরালয়ে, নিরাবলম্ব ঈশ্বরে নিমজ্জন। তাহাতে প্রার্থনা কিছুই নাই। কেবল জীবাত্মার অণিমা এবং পরমাত্মার মহিমার যুগপৎ উপলব্ধি মাত্র।

আবার ধর্ম্মে আমাদের অধিকারি-ভেদ। তোমাদের ওরূপ বিচার নাই,—সকলের পক্ষেই কুমারীর যুযু-সন্তান সমানে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। আসল কথা—একরূপ বিকৃত সাম্যের উপর তোমার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সংসার-কারবার, বিবাহ-ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার প্রবৃত্তি। আমাদের সমস্তই ভক্তিমূলক। আবার ভক্তির মূলে বৈষম্য। গোড়াতে তোমাতে আমাতে মিল নাই, আচার-ব্যবহারে তোমাতে আমাতে মিল নাই—লক্ষ্য বিপরীত পথে, বিপরীত দিকে; সুতরাং আমাতে তোমাতে যে আর্য্য অনার্য্য ভেদ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। তোমার ভাষা-বিজ্ঞানে যদি সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে তুমি আর্য্য, তাহা হইলে আমার বুড়ো বিজ্ঞানে বলিতেছে যে, আমি কখনই আর্য্য নহি। আমি যাহা আছি, তাহাই ঠিক; আমি—হিন্দু।

নবজীবন—৩য় ভাগ

ভাদ্র, ১২৯৩]

১২

নাম

কত প্রকারের যে নাম আছে, তা'র সংখ্যা করা যায় না। নানা জাতি-মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে যে নানাবিধ নাম থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্য নয় ; কিন্তু এক জাতি-মধ্যে, এক ভাষি-মধ্যে কত প্রকারের যে নাম আছে, তাহার স্থিরতা করা যায় না।

আমরা কিন্তু নাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। গোটাকত নাম পড়িয়া কৌতুকপ্রিয় লোকের সময় যাপন হইবে—এই মাত্র।

তর্জ্জনীবেগ—প্রসিদ্ধ উলাগ্রামে একজন ভদ্রলোক তাঁহার পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন।

ঘনরুচিরঞ্জন-ভবভয়ভঞ্জন,—কিন্তু বালককে সকলেই ঘনু বলিয়া ডাকিত এবং অতি অল্প বয়সে বালকটির মৃত্যু হয়, সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে নামদাতার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

একজন রসিকদাস বাঙ্গালি বাবাজির নাম ছিল, রাধাধূলি-ধূসর-নিতম্বাম্বর ক[illegible]দাস বাবাজি। কে এ বাবাজির নাম দিয়াছিল জানি না, কিন্তু তি[illegible]ই দিউন, তাঁহার কল্পনাশক্তি অতি বিচিত্রা ছিল, সন্দেহ নাই[illegible]রক। নিজ্ বাঙ্গালায় এরূপ নাম বড় একটা

দেখিতে পাওয়া যায় :না, কিন্তু বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশের নাম শুনিলে আমাদিগকে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

১৫ই অক্টোবর * কলিকাতা গেজেটে পারিকূটের রাজা একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তাঁহার নাম হইতেছে, গৌরচন্দ্র হরিচন্দন মানসিংহ মুদ্রাজ ভ্রমরবর। "নদের শোভা গোরা যেমন, গগনের শোভা শশী"—সেই গৌর আছেন, চন্দ্র আছেন, তারকব্রহ্ম হরি আছেন, কাষ্ঠশ্রেষ্ঠ চন্দন আছেন, বিষয়ী লোকের আদরের মান আছেন, পশুরাজ সিংহ আছেন, সর্ব্বকালে সর্ব্ব লোকের আরাধ্য মুদ্রাদেবী আছেন, আর পতঙ্গশ্রেষ্ঠ কুঞ্জবিলাসী ভ্রমরবর আছেন। মরি! এক নামে সংসারের সার! এমন নাম আর হয় না কি?

কিন্তু উড়িষ্যায় এমন নাম বিস্তর। কেওঞ্ঝরের রাজার নাম—ধনুর্জ্জয়নারায়ণ ভঞ্জদেব। ঢেঙ্কানালের রাজার নাম—ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর। হিন্দোলের রাজার নাম—ঈশ্বর সিংহ মুদ্রাজ জগদ্দেব। তেলচরের রাজার নাম—দয়ানিধি বীরবর হরিচন্দন মহেন্দ্র বাহাদুর ইত্যাদি।

বেহার অঞ্চলের তিন চারিটি দেবনাম-যুক্ত নাম পাওয়া যায়, আর রাজা-রাজড়ারই বড় নাম হইয়া থাকে কি না বলিতে পারি না।

ভাগলপুরের একজন জমিদারিণীর নামটি অতি উত্তম। তাঁহার নামটি এই—রাধাশ্যামশোভিত-কুঞ্জলতাবতী

---

* ১৮৭৩।

ঝাম্বিনী। ইনি ধুলিধ্বস্ত ইত্যাদি বাবাজির এবং ভ্রমরবরের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

পোড়া বাঙ্গালায় বড় নামে বড় অল্প। বড় লোকও কি অল্প? তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি। এখানে বড় লোকে বোধ হয় ছোট নাম ভাল বাসেন। "বড় হ'বি ত ছোট হ"—বাঙ্গালারই কথা কি না। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বড় লোকের নাম ভুদেব শর্ম্মা, দিগম্বর মিত্র ইত্যাদি। ইহাতে সাধারণ চন্দ্র, কুমার বা নাথ পর্য্যন্ত বসাইবার যো নাই। কিন্তু রাজা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি অনেক মান রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে,—তাহা না হইলে উড়িষ্যাবাসীদের ও বেহারীদিগের কাছে মুখ দেখান' ভার হইত।

কেবল বড় লোকেরই যে এরূপ নাম হয় তাহা নয়,—মুর্শিদাবাদে রেজেষ্টরী অফিসে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন,—তাঁহার নাম লাডলিমোহন, তাঁহার পিতার নাম ভারতহরি, তাঁহাদের নিবাস দণ্ডীবাটা। দণ্ডীবাটার ভারতহরি বসুর পুত্র লাডলিমোহন বসু। কেমন সুন্দর সংযোগ!

ঢাকা অঞ্চলে দু'টি একটি অপূর্ব্ব নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নামের নিয়ম বুঝিতে পারা যায় না। 'রামমাণিক্যের ভিটার পরে ডেঙ্গরচন্দ্রের ভিটা ও তাহার ওপাশে ফণীন্দ্রবিজয় দালান দিয়াছে।'

মৃত দীনবন্ধুবাবু যখন নদীয়া বিভাগে ছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনে দুই জন কর্ম্মচারী আছে—এক জনের নাম নদেরচাঁদ এবং আর এক জনের নাম নবদ্বীপচন্দ্র। দুই জনের এক অফিসে কর্ম্ম থাকিলে বোধ হয় [illegible] দিকে একটু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়।

মহাকবি সেক্সপিয়র বলেন বটে যে, নামে কিছুই এসে যায় না; * কিন্তু সে বাক্য তিনি প্রণয়ীর মুখ হইতে বহির্গত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা গম্ভীর-বুদ্ধিবলে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি। নামে যদি কিছু এসে যায় না, তবে সিদ্ধেশ্বরী বাজারে শাক বেচিতে বসিয়াছিল, তাহার নাম শুনিবামাত্র বাজারের গোমস্তা তাহাকে কুরূপা, কদর্য্যা, দুষ্টা বলিয়া তিরস্কার করিল কেন? গোমস্তা বলিয়াছিল,—"ঐ রূপ, ঐ বয়স, দু'পয়সার শাক বেচ্‌তে এসেছে, নাম কি না সিদ্ধেশ্বরী! তোর নাম রৈল পদ্দা। বাজারে আসিতে হয়, আসিস,—না হয় না আসিস্।" সিদ্ধেশ্বরী নামের জন্য এত তিরস্কার খাইল।

সকলেই জানেন, টানা লেখায় 'ধ' অক্ষর লিখিতে হইলে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। একজন মুহুরিকে কোন দিন রাধামাধব দেচৌধুরী লিখিতে হইয়াছিল। নামে যদি কিছু না এসে যায় তবে, চৌধুরীর পিতাকে অভক্ষ্য খাইতে মুহুরি বলিল কেন? চৌধুরীর ভগিনীর চরিত্র মন্দ, এমন কথা প্রকারান্তরে বলিল কেন? এক নামের দোষেই না চৌধুরীর এত খোয়ার। বাস্তবিক নামে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এ কথা কোন কাজের কথা নহে। একজন অতুলকৃষ্ণ নাম বলিলে তাঁহার প্রতি মন কেমন হয়,—আর একজন গোবর্দ্ধনচন্দ্র নাম বলিলে, মনে কিরূপ হয়?—সরিয়া বসিতে ইচ্ছা করে, যেন তাঁহার গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহিষ্কৃত হইতেছে,—এমনি বোধ হয়। বলিবেন, সেটি কুসংস্কার; অবশ্য। আমি-তুমি-ভেদ-জ্ঞান—ও যে একটি কুসংস্কার। কুসংস্কার আছে বলিয়াই ত ভাল-

* "What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet."
—Romeo and Juliet, Act II, Sc. 2.

মন্দ বিবেচনা করা যাইতেছে ; তাহাতেই ত এ নামটি ভাল, এ নামটি মন্দ বলা যাইতেছে। দেখুন না কেন, নামের জন্য সিদ্ধেশ্বরী ও চৌধুরী গালি খাইলেন, আবার নামে প্রহেলিকা হয়, সংস্কৃত শ্লোক হয় ও আশীর্ব্বাদ হয়।—

একবর্গ-সমুদ্ভূতশ্চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদঃ।
অনুলোম-বিলোমেন সদেব পাতু বঃ সদা॥

৯ অগ্রহায়ণ ১২৮০]　　　　[সাধারণী—১ ভাগ, ৫ সংখ্যা

১৩

চনকচূর্ণ

(প্রহেলিকা)

অনেকেই বলেন, "মহাশয়! একটা আধ্‌টা প্রহেলিকা সাধারণীতে দেন না কেন? দেখুন, পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে কেমন প্রহেলিকা দেখিতে পাওয়া যাইত,—এখনও ইংলিশম্যানের শনিবারের কাগজে কেমন সুন্দর সুন্দর প্রহেলিকা থাকে। আমরা এ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারি নাই। প্রত্যুত আমরা যে তাঁহাদের উপদেশের সারবত্তা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা এই প্রস্তাব আদ্যন্ত পাঠ করিলেই সকলে বিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

নানা দেশে নানা রূপ প্রহেলিকা প্রচলিত আছে,—এক বঙ্গদেশেই কত প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঢ়। বিখ্যাত রাঢ়াঞ্চলীয় পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এখানে যে কেবল শৌভঙ্করিক শাস্ত্রবেত্তা কাড়ানিক, সাটকিক, বৌড়কিক বিবুধাবলী জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এমন নহে, ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতিতত্ত্ব এ স্থানের বালকদিগের কণ্ঠস্থ। সচরাচর বালকেরা বিবাহের সভায় ব্যাকরণের সন্ধি পরিচ্ছেদের দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাহারই একটি উদাহরণ-স্বরূপ দেওয়া যাইতেছে। উত্তরটিও সঙ্গে সঙ্গে লিখিত হইল।

প্রশ্ন। পান্তাভাতে লোণ টৌক্‌রা কোন্ সন্ধি পায় ?
উত্তর। হাতে তুলে ব্যাতে দিলে প্যাট্‌কে চলে যায়,
হায় হায় প্যাট্‌কে চলে যায়॥

বাঙ্গাল দেশ। প্রকৃত বঙ্গক্ষেত্রবাসীদিগের বুদ্ধিমত্তার কথা লোক-প্রসিদ্ধ, সুতরাং সে বিষয়ে সবিস্তার বর্ণন করিতে যাওয়া মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজনের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। সেই বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় নিম্ন-লিখিত প্রহেলিকায় এবং কথোপকথনে প্রকাশ পাইবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, ইটার অর্থ কও স্বাহি—'গোঁৎ গোঁৎ করি যায়, নাগর মুতা তুলি খায় ?'

যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি মস্তক ধারণ করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। সকলেই জানেন, প্রকৃত বঙ্গবাসীর অধ্যবসায় অত্যন্ত; অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যামন, লাঙ্গুল আছে নাহি ?"

উত্তর। আছে।

প্রহেলিকা-পূরণ।—তবে অইছ, চুনের ভাঁড়্‌ডা।

উড়িষ্যা। যাঁহারা বীমস্ সাহেব বা হণ্টর-সাহেব-কৃত উড়িষ্যা-বাসি-সম্বন্ধীয় কোন প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উড়িয়ারা পুরাণশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত; আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমাদের সাক্ষাতে বাগানের মালি এক দিন তাহার নবাগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"জগন্নাথ বড়, কি গঙ্গা বড় ?" তাহার [illegible]তা তাহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল,—"মাও বড়, [illegible] বড় ?" আমাদের মালি কিঞ্চিৎ লজ্জিত

হইয়া বলিল,—"হৌচি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইল?" মালি বলিল,—"ঐ কথা আর মুখে আনিব না।"

এই কথোপকথনের পর হইতে আমরা উক্ত সাহেব দ্বয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়াছি। এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, উড়িয়ারা যেমন পুরাণ বুঝে, এমন আমরা কোন কালেও বুঝিতে পারিব না। পাঠকবর্গের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটি ঔৎকলিক পৌরাণিক প্রশ্ন বা প্রহেলিকা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম:

"যখন দশরথ-তনয় রঘুবীর তূণ হইতে দশগোটা খাজুর বৃক্ষ পাকাইল রাবণের তুণ্ডে,

তুণ্ড ফাটিগিলা হু;

কতি বেলি কুঁ? কাত বেলি কুঁ?"

হুগলি অঞ্চল! এখানকার কোন কথাই আমরা বলিতে পারি না—মন্দ বলিলে নিমক-হারামি হয়, ভাল বলিলে অহঙ্কার করা হয়। যাহা হউক, আজি কালি চলিত এখানকার একটা প্রহেলিকা বলিতেছি।

গঙ্গার উপরে দিব্য সোনার নাচঘর, (১)

তাহার মাঝে বাস করে রূপার লক্ষীন্দর। (২)

---

(১) ভাগীরথীর উপরে যে সুরম্য অট্টালিকায় হুগলি কলেজ অবস্থিত, সেটি পূর্ব্বে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নাচঘর ছিল—এই বাড়ীতে নৃত্য, গান, বাজনা হইত। হালদার মহাশয় নোট জাল করায়, তাঁহার দ্বীপান্তর-বাস হইয়াছিল।

(২) তখন রবার্ট থোয়েটস্ (Robert Thwaytes) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। প্রিন্সিপ্যালেরা বরাবর কলেজ-বাড়ীতেই বাস করেন।

চৌষট্টি নাগ গেল তার দিতে এক্‌জামিন,
ষোল নাগ তার পাশ কাটিয়া এল ত সে দিন। (৩)
বিষহরির কাছে নাগে কল্লে গিয়া থানা,—
'পড়ায় না বোঝায় না, তার শুধুই জরিমানা।'
—মুসলমানের টাকা, (৪) তার সাহেব ম্যানেজার,
হিন্দুর ছেলে গর্জ্জে উঠে—এ কোন্ ব্যাভার?

কলিকাতা। কলিকাতার লোক রাজনীতি-বিশারদ। কলিকা[তা] রাজধানী; রাজধানীতে যে রাজনীতির চর্চ্চা অধিক হইবে, তাহার আ[র] আশ্চর্য্য কি? এখানকার প্রহেলিকাও সেইরূপ নীতিপূর্ণ।

বিধাতা-নির্ম্মিত গৃহ নাম বেল্‌বিদার,
যোগীন্দ্র পুরুষ * তায় করেন বিহার।
পুরুষ বরের যবে হয় ত খেয়াল,
চিঠিতে রেজোলিউসনে বাঙ্গালা করেন আলথাল।
শিশির ঘোষে † বুঝিতে পারে একই নিমিষে,
কৃষ্ণদাসে ‡ বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।

১৩ মাঘ, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ১৪ সং[খ্যা]

(৩) ১৮৭২ খৃ: অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হইত।

(৪) দানবীর মহম্মদ মহসীনের [টা]কায় হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* তখনকার বাঙ্গালার ছোট[লাট] সার জর্জ ক্যাম্বেল।

† 'অমৃতবাজার প[ত্রিকা]র [সম্পা]দক শিশিরকুমার ঘোষ।

‡ 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-স[ম্পাদক] কৃষ্ণদাস পাল।

১৪

চুল্লি না নির্ব্বাণ হয়

অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্। সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি দিকে দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল। ক্ষিত্যপ্‌মরুদ্‌-ব্যোম ক্রমে তেজে পরিণত হইতে লাগিল। এক ভূতে চারি ভূতকে গ্রাস করিতে লাগিল। পৃথিবীতে তরু, লতা, গুল্ম, শৈল, শেখর সমস্তই শিখাধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। জলে শৈবাল—সরোজ সকলই জ্বলিতে লাগিল; সাগরে বাড়বানল বিক্রম বিস্তার করিতে লাগিল। পবনদেব অগ্নিবাহন হইয়া দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; আকাশ-মণ্ডল জ্বলদ্ধূম-পরিব্যাপ্ত হইল। সৃষ্টি দগ্ধ হয়! ব্রহ্মা ভীত হইলেন; অগ্নিদেবকে আহ্বান করাইলেন, বলিলেন,—"একি প্রকার কাণ্ড?" বৈশ্রবণ উত্তর করিলেন,—"আমি সর্ব্বভুক্।" ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, "ন দেবঃ সৃষ্টি-নাশকঃ;—আপনাকে সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে।" অগ্নি উত্তর করিলেন,—"যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আমি তেজঃ সংবরণ করিতে পারি,—অদ্যাবধি আর কেহ আমাকে আহ্বান না করিলে আমি প্রজ্বলিত হইব না এবং যখন যেখানে ভক্ষ্যের অভাব হইবে তখনই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইব।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সেই রূপই হইবে।" অগ্নি তেজঃ সংবরণ করিলেন।

ইহার কতকাল পরে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দশাননের নিপাত সাধন করিয়াছিলেন। রাবণরাজ শ্রীরামকে রাজনীতির উপদেশ প্রদান করিয়া সাগর-তটে একবার বিংশতি লোচনে চিরশত্রু দশরথাত্মজকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই বিংশতি লোচন মুদিত করিলেন; সেই বিংশতি লোচন সেই নমীলিত হইল, আর খুলিল না। শোকার্ত্ত বিভীষণ সৎকারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা চারি দিক্ হইতে রাশি রাশি চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃতকুম্ভ, গুগ্‌গুল, শাল-নির্য্যাস আনয়ন করিতে লাগিল,—রাবণরাজার সৎকার হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র মৈথিলীকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন,—মন্দভাগিনী মন্দোদরী সে কথা শুনিলেন। তিনি হৃদয়াগ্নি হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রণাম করিতে অশোক-বনে গমন করিলেন, প্রণতা হইলেন। মন্দোদরী এ দিনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে আসিবেন, জানকী তাহা মনেও ধারণা করিতে পারেন নাই। কোন সধবা রাক্ষস-পত্নী বোধে সরল মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরায়তি ধারণ কর।" মন্দোদরী প্রণাম কালেই বস্ত্রাঞ্চল নয়নাঞ্চলে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, সেই কঠোর আশীর্ব্বাদে আর থাকিতে পারিলেন না, রোদন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "মাতঃ, এ কিরূপ বিড়ম্বনা?" তখন জানকী সকল জানিতে পারিলেন, লজ্জিতা—সঙ্কুচিতা হইলেন। উভয়ে একত্র রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা রোদন সংবরণ করিয়া বলিলেন, "মন্দোদরি! সতীবাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে, লঙ্কেশ্বরের চিতা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিবে।" রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতেছে। বিভীষণানুচরেরা প্রত্যহ চন্দনাদি ইন্ধন প্রদান করিয়া থাকে, চিতা জ্বলিতেছে। সর্ব্বভুক্ অনল ভক্ষ্য না পাইলে নির্ব্বাণ হই বন, সুতরাং প্র[illegible] কাষ্ঠাদি প্রদান করিতে হয়।

ইহার বহুকাল পরে লঙ্কাদ্বীপ উদ্ভিদ্‌-শূন্য হইয়া উঠিল, বৃক্ষ কাষ্ঠাদির চিহ্ন লঙ্কাদ্বীপে নাই। রাক্ষসেরা দাক্ষিণাত্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতায় নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে। ক্রমে ভারতবর্ষ ইন্ধন-শূন্য হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। সমূহ বিপদ উপস্থিত—উদ্ভিদ্‌-সৃষ্টির লোপ হয়! বৃহৎ বৃহৎ বিটপীসকল সমবেত হইয়া ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বটাবটপী শিরে জটাভার ধারণ করিয়া পদ্মাসনে নদীতীরে যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন; বিশাল শালরাজি শৈলশিখরে উর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল; শাল্মলী, অশোক, কিংশুক, মন্দার, পলাশ, কাঞ্চন—রক্তবসনে যোগাভ্যাস করিতে লাগিল। কেহ জটাশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল, কেহ পঞ্চতপা করিল, কেহ উদয়াস্ত করিল, কেহ কুম্ভক করিল। ভাবুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ওরে ত্যাজ্য ক'রে ভোগ-বাসনা,
করিস রে কেন যোগ-সাধনা?"

তরুরাজ উত্তর করিল না, মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিল। ভাবুক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বল্‌রে তরু! প্রভাত হ'লে,
কেন ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন-জলে?"

বৃক্ষগণ উত্তর করিল না, হুঙ্কার করিয়া তাহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিল।

কতকাল পরে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"বর প্রার্থনা কর।" তরুরাজি প্রণাম করিয়া বলিল,—"দেব! এরূপ উপায় করিয়া দিউন, যাহাতে বিভীষণানুচরেরা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে লুপ্ত না করিতে পারে।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তথাস্তু।" পরে ধ্যানবলে সমস্তই অবগত

হইলেন; অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। দেখিলেন, রাবণের চিতা চিরপ্রজ্জলিত রাখিতে হইবে, তজ্জন্য অনলকে নিয়মিত ভক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক, তাহা প্রদান করিতে হইলে ক্রমে উদ্ভিদ্‌বর্গের লোপ হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্-সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। প্রধান কথা—চুল্লি না নির্ব্বাণ হয়। প্রজাপতি স্বীয় অসাধারণ প্রভাবলে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন—চুল্লির অনল রক্ষার্থ প্রত্যহ যে পরিমাণে ইন্ধনের প্রয়োজন, সিংহলের উদ্ভিদ্‌বর্গে এমনি শক্তি নিবেশিত করিলেন যে, তাহারা প্রত্যহ সেই পরিমাণে ইন্ধন প্রদান করিয়াও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকিবে। তদবধি সিংহল দ্বীপে বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে, শীঘ্র প্রবর্দ্ধিত হয় এবং বহুকাল জীবিত থাকে। রাবণ-চুল্লি অপ্রতিহত প্রভাবে জ্বলিতেছে।

ইংরাজেরাও অনলের ন্যায় সর্ব্বভুক্। যে দিন দ্বিতীয় হেন্‌রী আয়র্লণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ইঁহারা বিশ্বসংসার গ্রাসে প্রবৃত্ত। সেই দিন হইতে উত্তরে স্কট্‌লণ্ডে, পশ্চিমে আমেরিকায়, দক্ষিণে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, পূর্ব্বে ভারতে—চারি দিকে দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল। যেমন অনলে ক্ষিত্যপ্‌মরুদ্‌ব্যোম চারি ভূত গ্রাস করিয়াছিল, তেমনি রেড্ ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি, মওরি, মালায় প্রভৃতি বহু ভূতকে এক ইংরাজ-ভূতে গ্রাস করিতে লাগিল। এই মূর্ত্তিমান্ অনলদেব তরুলতা-গুল্মাদির পরিবর্ত্তে রাষ্ট্র, রাজ্য, বংশ, সৈন্য, ধর্ম্ম, ভাষা—সকলই খাইতে লাগিলেন। এখন পবনের পরিবর্ত্তে বরুণ ইঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্থল-জল ইঁহাদের কামানের ধূঁয়ায় পরিব্যাপ্ত হইল। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু আমেরিকা-ভূমে ওয়াসিংটন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমেরিকা-ভূমিতে অনল নির্ব্বাণ করিলেন এবং ভারতবর্ষে লোকনিন্দারূপ রুদ্রাবতার আসিয়া অনিলকে আদেশ

করিলেন যে, সৃষ্টিনাশ করিও না ; যখন যেখানে ভক্ষ্যের অভাব হইবে, তখনই সেইখান হইতে অন্তর্হিত হইবে।

পরে ১৮৫৮ সালের ত্রেতায় বিদ্রোহরূপ সহস্রমুণ্ড রাবণের নিপাত হইলে, বিদ্রোহ-কুলক্ষ্মী ভারতমাতা মহারাজ্ঞীর পদে প্রণাম করিল। বৃটনেশ্বরী ভ্রমক্রমে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি স্বতন্ত্র শাসিত হইবে।" ভারত রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"মা! এ কিরূপ বিড়ম্বনা?" রাজ্ঞী বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন "সতীবাক্য অলঙ্ঘনীয় ; বিলাতে একটি 'ইণ্ডিয়া-আফিস' থাকিবে, তদ্বারা ভারত সুশাসিত হইবে।" এইরূপ হইতে লাগিল। প্রত্যহ জ্বলচ্চিতা নিরীক্ষণ করিয়া মন্দোদরীর যেরূপ আয়াত-রক্ষা এবং সুখানুভব হইত, ইণ্ডিয়া-আফিসে ভারতের সেইরূপ সুশাসন হইতে লাগিল।

যাহা হউক এই রাবণের চিতা জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বভুক্ ভারত-সম্পর্কীয় ইংরাজ ভক্ষ্য না পাইলে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তাহাতেই প্রত্যহ বিলাতীয় ব্যয় বা হোমচার্জ্জস্বরূপ ইন্ধন আমাদিগকে যোগাইতে হয়।

এই ইন্ধন-ক্ষয়ে ক্রমে ভারতের উদ্ভিদ্-কলাপ ক্ষীণ হইতেছে। রাজ্ঞীর বরে যে চিতা জ্বালিত হইয়াছে, তাহা চিরদিন সমভাবে জ্বালিত রাখিতে হইবে,—চুল্লি নির্ব্বাণ না হয় ; অথচ সর্ব্বভুক্ বৈশ্রবণের গৌরব রক্ষা করা চাই। তাহাতে ভারতীয় শাল, তাল, তমাল নিয়ত তপস্যা করিতেছে। জমীদাররূপী শাল বৃক্ষগণ "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নামক ঘোর অরণ্যে বসিয়া বড় বড় চিঠি লিখিয়া তপস্যা করিতেছেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মরূপী তাল বৃক্ষগণ লেক্‌চারে লেক্‌চারে যীশুস্তুতি করিয়া যোগসাধনা করিতেছেন। কোথাও তমালের দল আপন গৃহে কুঞ্জ সাজাইয়া পূজা-পার্ব্বণে বিলাতী রাধাকৃষ্ণ সংস্থাপিত করিয়া নর্ত্তকী-কোকিল ডাকাইতেছে। কোথাও

রূপক ও রহস্য

উমেদাররূপী কদলী বৃক্ষসকল বিদ্যারূপ কলার কাঁদি লইয়া ইংরাজ-পদে প্রণত হইতেছেন। কোথাও মুসলমানেরা বেল সাজিয়া ইংরাজের চরণে নেড়া মাথা বাড়াইয়া দিতেছেন। তেঁতুলের দল ইংরাজি-বাঙ্গালায় সংবাদ পত্র লিখিয়া অম্ল রসে ইষ্টদেবের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন এবং অধিকাংশ বাজে কাঠ কেবল পুড়িলাম পুড়িলাম করিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্রহ্মা যে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, বৃটনীয় সিংহরাজ সেই বিপদে পতিত হইয়াছেন। এখন এরূপ বর পাওয়া যায় যে, দেশীয় বৃক্ষবর্গ এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইবে যে, অনায়াসে বিলাতস্থ চিতার ইন্ধনের সঙ্কুলান করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে এবং শাখা-ফল-পুষ্প বিস্তার করিবে—তবেই সর্ব্বরক্ষা; নহিলে আমাদের ঘোর বিপদ, তরুরাজি দিন দিন ক্ষীণ হইবে!

১ চৈত্র, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ২৩ সংখ্যা

১৫

নূতন বেতাল পঁচিশ

(তিনটি প্রশ্ন)

১

বিলাতী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম,—"আমার সদ্যঃ প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান-জন্য একটি অবিবাহিতা সচ্চরিত্রা দুগ্ধবতী ধাত্রীর প্রয়োজন।" দেশী সকল কাগজেই বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে,—"ঘনরাম *অগ্রহায়ণ হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।" বল দেখি, দেশী-বিলাতী—এই উভয় বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রশংসনীয়?

২

চীফ্ জষ্টীস্ বলিয়াছেন, বিলাতে যখন লাইবেলের মোকদ্দমায় কঠিন দণ্ড হয়, তখন ভারতে আদালত অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অবশ্যই কঠিন দণ্ড

---

* "বিজ্ঞাপন—ঘনরাম-প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।...... এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ১২শ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।......

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়, ৩১নং চাপাতলা কার্ষ্টলেন, কলিকাতা। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঘনরাম-প্রকাশক।" জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০।

হইবে। প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছিল, 'শ্রীগোপাল পাল-চৌধুরীর হাতীটা যখন মরিয়া গেল, তখন বামনদাসবাবু আর টেঁকেন না!' বল দেখি, এই উভয়ের মধ্যে তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত কে? *

৩

হিন্দুপেট্রিয়ট প্রথম সপ্তাহে বলেন,—"হাইকোর্টের বিচার আমরা অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম। হাইকোর্টের পক্ষ সমর্থন করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য।" তাহার পর সপ্তাহে বলিয়াছেন,—"কে, কবে হাইকোর্টের বিচারের পোষকতা করিয়াছি?" আর আনন্দবাজার নিজে বাঙ্গালা কাগজে গলদ্ ছাপাইয়া, ইংরাজি কাগজে মাপ চাহিয়া—সুরেন্দ্রনাথ আপন ভ্রম দেখিতে পাইয়া আদালতে ত্রুটি স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বলিতেছেন। বেতাল কহিল, বল দেখি, এই উভয়ের মধ্যে অধিক বেহায়া কে?

বিক্রমাদিত্য মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন। †

৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০] [সাধারণী—২০ ভাগ, ৬ সংখ্যা

---

*শ্রীগোপাল পাল-চৌধুরী রাণাঘাটের এবং বামনদাস মুখোপাধ্যায় উলার প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। বামনদাসবাবুর সময়ে উলার একজন পাগল ছিল, তাহার নাম প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে।

† ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের অবমাননা করার অপরাধে দুই মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। চীফ জষ্টীস্ গার্থ, জষ্টীস্ ম্যাক্‌ডোনাল, কনিংহাম, নরিস এবং রমেশচন্দ্র মিত্র—হাইকোর্টের এই পাঁচজন বিচারপতি তাঁহার সরাসরি বিচার করিয়াছিলেন।

১৬

শিরোবচন নাটক

প্রথম অঙ্ক

স্থান—সাধারণী-কার্য্যালয়

সূত্রধার-বেশে তত্ত্ববোধিনীর প্রবেশ। গম্ভীর মূর্ত্তি, গাত্রে লোহিত-কৃষ্ণ-ব্রহ্মনামাঙ্কিত ব্রহ্মনামাবলী।

নান্দী

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।" তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

পরে নট-বেশধারী সোমপ্রকাশ আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন,—

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

তাহার পর উপনট ঢাকাপ্রকাশ বঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"অলমতি বিস্তরেণ, সিদ্ধিঃ সাধ্যো সতামস্তু।"

সমাজদর্পণ[১] উত্তর করিলেন,—"হাঁ তা' বটে কিন্তু, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।"

ইতি প্রস্তাবঃ।

(সকলের প্রস্থান)

খড়দহনিবাসী বিজ্ঞান-বিকাশ ভট্টাচার্য্য পুষ্প চয়ন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থান দিয়া তদীয় গৃহিনী পাবনা চাটমোহর-নিবাসিনী জ্ঞানবিকাশিনী গঙ্গাস্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র হাতে লইয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যঙ্গ্যচ্ছলেই হউক, সদুপদেশ-প্রদানার্থই হউক একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

"বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোবদ্রক্তপুষ্পসমীপতঃ
তদ্বর্ণযুক্ভাতি বস্তুতো নাতিরঞ্জনাৎ।"

জ্ঞানবিকাশিনী ঠাকুরাণী গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের উপদেশ-বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারও পিতৃপ্রসাদাৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়া ছিল। কর্ত্তাটির শ্লোকের ভাব-ভঙ্গী সকলই বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন,—"তোমাদের ঐরূপ হইয়া থাকে, যখন যার কাছে তখন তারই মতন, কিন্তু আমি বলি—স্পর্দ্ধা করিয়া বলি,—

'ভাস্বতী ভাস্করস্যান্তে কৌমুদীব চ কৌমুদে,
দেশদোষতমঃ শাম্যে পত্রী জ্ঞানবিকাশিনী'।"

মধ্যস্থ[২] কবিরত্ন এমন সময়ে আসিয়া উপস্থিত; দেখিলেন দম্পতী-

১ যশোদানন্দন সরকার-সম্পাদিত খুলনা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা।

২ নাট্যকার মনোমোহন বসু-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা।

কলহে ঘরটা একেবারে ছারখার যায়; অগ্রসর হইয়া রঙ্গক্ষেত্রাভিমুখে বলিলেন,—

"নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহ যবীয়সোঽপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।

নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥"

হিতকরী ৩ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবিরত্ন মহাশয়! কি বলিতেছেন?" মধ্যস্থ উত্তর করিলেন,—"এই বিবাদ ভঙ্গের যত্ন করিতেছি। হিতকরী বলিলেন,—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"

সেই পথ দিয়া একজন বরিশালের হরকরা বার্ত্তাবহ ৪ যাইতেছিল। সে মধ্যস্থ কবিরত্নকে উৎসাহ প্রদানার্থই যেন বলিল,—"যত্নেন কিমসাধ্যম্।" একজন রাণাঘাট গ্রামবাসীও ৫ উপস্থিত ছিলেন; তিনি অমনি এক পাশ হইতে অতি মৃদু অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"যিনি নিজে চেষ্টা করেন, ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন।" তাহাতে হিন্দুহিতৈষিণী ৬ উত্তর করিলেন, "সেই চেষ্টা কেবল কথায় করিলেই ত হইবে না, কাজে করা চাই। শাস্ত্রের একটা মূল কথা মনে নাই,—"কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মঃ।" বরিশালের হরকরা আগে কথা কহিয়াছে, সুতরাং কলিকাতার দূত ৭ বুক ফুলাইয়া বলিল,—"তা নয়, কাজে না করিলে কিছুই নহে,—

---

৩ বরিশাল হইতে প্রকাশিত 'হিতসাধিনী' পত্রিকা।

৪ 'বরিশাল-বার্ত্তাবহ'।

৫ রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত 'গ্রামবাসী' পত্রিকা।

৬ হরিশ্চন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা।

৭ 'বঙ্গদূত' পত্রিকা।

'যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও'।"

কাঁচড়াপাড়া-পত্রিকা সকল কথা মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। রাণাঘাট গ্রামবাসীর কথায় তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তি দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি আপনাআপনি স্বগতা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—

"জগতে যেথানে যত লোকালয় রয়,
সেই সেই স্থানে তুমি হইয়া উদয়,
ঈশ্বর-প্রসাদে সত্য করিয়া স্থাপন,
কর গিয়া সমাজের উন্নতি-সাধন।"

তিনি স্বগতা বলিয়াছিলেন; তাঁহার এ কথা কেহই শুনিতে পায় নাই। সাহিত্যমুকুর * দূতের বচনের পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও, কিন্তু কাহাকেও, বিশেষতঃ সাময়িক পত্র-সকলকে অবজ্ঞা করিও না, বরং

'যেথানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার লুকান' রতন'।"

এ কথা সুলভ সমাচারের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন,—"সকল সময় সামান্য রত্নের অনুসন্ধান নাই করিলাম, কিন্তু জ্ঞানোপার্জ্জনে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। দেখ,—

---

* কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

'ধন-মান লাভ করি—সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান-ধর্ম্ম চাও যদি—অবারিত দ্বার,
দরিদ্র-ধনীর সেথা সম অধিকার'।"

চন্দননগর-পত্রিকা এই সকল কথাবার্ত্তায় ক্রমেই বিরক্ত হইতেছিলেন; শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া পক্ষভেদ করিয়া উত্থান করিলেন, বলিলেন,—"তুমি জ্ঞান-ধর্ম্ম সঞ্চয় কর, আর যাই কর, তুমি স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও বা না হও, তাহাতে দেশের লোকের ক্ষতিবৃদ্ধি কি হইতে পারে? দেশের লোকে তোমার সাহায্য করিবে কেন? তা নয়—

'দেশহিতে পরহিতে রত হও ভাই,
এর চেয়ে জীবনের কর্ম্ম আর নাই'।"

বরিশালের হরকরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এখন মনের মত কথা হওয়াতে বলিয়া উঠিল,—

"ধন্য ধন্য ধরা মাঝে ধন্য সেই জন,
দেশহিত তরে যেই করে প্রাণপণ।"

এই বলিয়া তাহার ডাকের সময় হইল, সে চলিয়া গেল। কিন্তু দেশ-হিতৈষিতা বাঙ্গালায় অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এই কথোপকথনে অনেকেই যোগ দিলেন। শুভসাধিনী * বলিলেন,—

"দেশার্থং সর্ব্বমুৎসৃজেৎ।"

---

* কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

হাবড়া-হিতকরী বলিলেন,—"আমরা আশীর্ব্বাদ করি। ভবতু পরহিতার্থী সর্ব্বথা লব্ধকামঃ।" সহচর শর্ম্মা বলিলেন,—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী।"

সাপ্তাহিক সমাচার পার্শ্বে রবরহিত দণ্ডায়মান ছিলেন,—সহচরের কথা শুনিয়া একটু ঈষৎ হাস্য করিলেন, কথা কহিলেন না।

বামাবোধিনী বলিলেন,—"তোমরা দেশহিতের কথা বল, কিন্তু কেবল পুরুষেরই হিতকথা কহ। তোমরা কি ভুলিয়াছ যে,

'কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'—

ইহা কিরূপ ন্যায়পরতা?"

বালারঞ্জিকা * বলিলেন,—"পুরুষদিগের ন্যায়পরতা একেবারে নাই। আমরা স্ত্রীলোক, আমরা বলি,—স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া পড়ে, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও,—কিন্তু বোন্, আমাদের কথা কেহই শুনিবে না। আইস' আমরা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি,—

'কৃপাকর দীননাথ অধীনীর প্রতি,
তোমাবিনা অবলার নাহি অন্য গতি'।"

বালারঞ্জিকা রোদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই রোদন দেখিয়া সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন, ভট্টাচার্য্য-দম্পতীর বিবাদ ভঙ্গ হইল। সকলেই দেশহিতে, পরহিতে, স্ত্রীশিক্ষা-প্রদান-জন্য, অথচ কেবল "স্বকার্য্য সাধন"-উদ্দেশ্যেই নানা দিকে প্রস্থান করিলেন।

---

* মাদারীপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা।

বেলা হওয়াতে সাধারণীর কার্য্যালয় বন্ধ হইল। সুতরাং এইখানেই যবনিকা পতন এবং শিরোবচন শীর্ষক অপূর্ব্ব নাটক সমাপ্ত।*

২০ মাঘ, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ১৫ সংখ্যা

* তখনকার পত্রিকা সকলের মধ্যে অনেকগুলির শিরোদেশে বা মাথার উপর একটি করিয়া motto বা পত্রিকার উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক বচন উদ্ধৃত থাকিত। সেই সকল শীর্ষোদ্ধৃত বচন বা শিরোবচনগুলি লক্ষ্য করিয়া এই রচনা লিখিত হইয়াছে।

১৭

ভাই হাততালি

ভাই হাততালি! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,—তোমার চট্ চট্ গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটুপটু চট্‌চটিতে সে হেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদস্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হয়! কালামুখ হাততালি, তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জ্জনের তাড়নায় দুর্জ্জয় কেশবচন্দ্রের তির্য্যক্-গমনের কথা ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়। প্রথম সেই সুন্দর, গৌর, সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তির ছদ্মচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, উপাসনারত, নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কূট-দর্শন-তর্ক-ভেদ-কারিণী তীক্ষ্ণা বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর—অবিরাম ধর্ম্মালোচনা, সেই উজ্জ্বল-কিরণ-

বিকিরণ-কারিণী উদ্দীপনা—সকলই মনে আসে। তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত-বায়ুবিগুণে, সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে দূরে বিদূরে হিমপরিপূরিত নীহারিকাময় গগনপ্রান্তে পরিভ্রমণ—সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি, তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃত কার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আর, তুমি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি—এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভ গ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ,—তোমার শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, শান্তি নাই। বরং জয়োন্মাদে উল্লসিত হইয়া দিন দিন আরও বল সঞ্চয় করিতেছ —এই সকল কথা ভাবিয়া মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যে দিন শুনিলাম তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি-তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাততালি, তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গ-সন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্র ভ্রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন।

এক দিন যে কেশবচন্দ্র যূদীয় অবতার খৃষ্টের পূর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতিঃ উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জ্জনে

সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন, (Father! forgive them,—they know not what they do.)—"পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।"—সেই দিনের সেই ভক্তি-হুঙ্কারে উপস্থিত 'সাক্ষণের' পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয় ইংরাজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিক তাঁহারা যে কি করিতেছেন, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই এক দিন—আর সেই কেশবচন্দ্র কয়বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই জনতা-মধ্যে, তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকী! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—(Yet I am a singular man!)—"তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব।" য়ুদীয় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর এই 'গৌরীভার' সেন-বংশের ধরাতলস্থ কেশবচন্দ্র; সুমেরু কুমেরু ব্যবধানেও এই দূরত্ব পরিমাণের মানদণ্ড হয় না। পোড়া হাততালি! তোমার কলঙ্কের কীর্ত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে কন্যার সুখাভিলাষে বৈষয়িক করিলে, তাঁহার বক্ষঃ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিলে,—এখন সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই হাতে ধ'রে, ভাই হাততালি! তোমাকে বলিতেছি—ভাই, দিন কতক তুমি ক্ষান্ত হও; আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী, দুঃখিনী, বিদুষী রমাবাই* ভিক্ষা করিতে ভ্রাতার সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন।

---

* পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী। ইঁনি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। শ্রীহট্টের উকীল বিপিন-বিহারী সাহার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর খৃষ্টান-সমাজের

তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিতা, ভাগবতে ব্যুৎপন্না, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রমনিরতা ও কার্য্যে পটীয়সী। এ হেন স্ত্রীরত্ন ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বস্তু, পূজনীয়া দেবতা। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা, সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমারী-পূজা ভারতে চির-প্রচলিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চির প্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা করিল না, বুঝিল না। তুমি হাততালি! বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলে তোমাকে সহায় করিয়া রমার তোষামোদ করিল। রমা বিদূষী হইলেও অবলা, পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমতি। কাজেই রমার মাথা ঘুরিল, মন টলিল, আগুন জ্বলিল। সে আগুন এখনও নিবে নাই।

এক দিন ছিল, এক সময় ছিল,—তখন রমার অগ্রজ সস্নেহ অথচ কর্কশ কণ্ঠে "এ-এ রমা" বলিয়া ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীরপদবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্দুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রীর মত অগ্রজের পার্শ্বে সলজ্জভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোমার বায়ুবিগুণে বৈদেশিক আসুরিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে * সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন,—ভারতের গৌরবশ্রী যে দিন সেই উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল,—সেই আর এক

আশ্রয়ে রমাবাই বিলাত গিয়াছিলেন এবং সেইখানে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে পুনা নগরে "সারদাসদন" নামে মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইঁহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৩২৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

* আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য দয়ানন্দ সরস্বতী।

দিন—আর, আর—যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচলচিত্তে বিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—সেই এক দিন, সেই এক দুর্দ্দিন। তাই বলিতেছিলাম, পোড়া হাততালি, তুমি কি সকল সময়েই আমাদের কেবল অহিত সাধন করিবে? তোমার কি শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই?

ভাই হাততালি! আর যা কর তা কর, দিন কতক গোটা দুই তিন লোককে স্থির থাকিতে দাও। দোহাই তোমার হাসি মুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের, দোহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহস্র জিহ্বার—দিন কতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও—তিষ্ঠিতে দাও।

এক জন এই সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল; স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয়-তালের জন্য লালায়িত। তবু ত সুরেন্দ্রনাথ দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাবেন—আজিকার দিনে সে কি কম কথা? স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। অপরাধ লইও না, সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্তদান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর নও। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর, কিন্তু স্বার্থানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয়া যান? তাঁহার চরিত্র যে এরূপ বিসদৃশ তাহা ত স্বীকার করিতে পারিলাম না,—তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? না—ভালতে মন্দতে এখনও

সুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব, জাতির গৌরব—দেশের গৌরব। যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়, তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে; আর কলঙ্কী হাততালি! তোমার দোষে হইবে।

রাজনীতির অকূলসাগরে সুরেন্দ্রনাথের চপলামতি তরণী একটুতেই বিক্ষোভিত হইতেছে,—যে পার সে রক্ষা কর। পাঠ্যাবস্থা শেষ হইতে না হইতে তিনি সিবিল সর্ব্বিস কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত; রাজসেবায় প্রথম বয়সেই চপল-স্বভাব-নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক-জীবনের পাঁচ বৎসর না গত হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার-দোষে কারাবন্দী—যে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ, যে মনে করিতে চায়, সে করুক,—আমরা তাহা করিব না। না, সুরেন্দ্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী—এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে। তবে যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়—সে আমাদের দোষেই হইবে—আর কালামুখ তুমি, তোমার চট্‌চটির খরতালে হইবে।

আর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল,—রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ান্‌গণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাস্যে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স-বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই।—তাই হাততালি, তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রূপক ও রহস্য

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা ; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান্ আলোকে চারি দিক্ আলোকিত করিবে ; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি-তৈল-নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ, ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভরস্পন্দিত পদ্মপলাশ লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী-বিনায়িত-চিকুর-ঝল-ঝল মুখমণ্ডল—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান' হাসি-খুসী-ভরা অধর-প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর-ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল্য সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল ; তুমি না লাগলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে ? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চট্‌চটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ-সন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে ? ভাই! স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,—তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি ?

মাঘ, ১২৯১] [নবজীবন—১ম ভাগ

১৮

পদ্য-পত্র

পরম-প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বামদেব দত্ত,

ভাইজিউ কল্যাণবরেষু।

ভাই! প্রবন্ধ হইল না, পদ্যে পত্র লিখিতেছি—

১

গঠো না গঠো না ভাই, প্রতিমা এ দেশে,
মৃত্তিকা পুত্তলিমাত্র হবে অবশেষে ;
কাঠ বাঁশ খড় দড়ি তুষ মাটি রঙ্—
জড়' করি করিবে হে চমৎকার সঙ্ ;
কুরসী গহনা দিবে, আরসী বসাবে,
কল্কায় শিখিপুচ্ছ অবশ্য লাগাবে,
ঢাক ঢোল বাজাইবে, করতালি দিবে,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কিন্তু করিতে নারিবে।
না মিলিবে পুরোহিত, না মিলিবে মন্ত্র,
শুদ্ধ আড়ম্বর হবে—ফক্কিকার তন্ত্র।

২

যে দেশে ব্রাহ্মণ নাই, সে দেশে সাকার
প্রতিমা গঠার চেয়ে ভাল নিরাকার ;—

চক্ষু মুদে ব'সে আছি নাহিক বালাই,
ভূতশুদ্ধি মনঃশুদ্ধি—কোন শুদ্ধি নাই ;
নাহি লাগে তন্ত্র-মন্ত্র, নাহি যন্ত্র, জল,—
দেহের দোলন মাত্র সাধন কেবল।
সে বেশ ! যেমন দেশ তেমনি বিধান,
হাড়ী ঝি চণ্ডিকা দেবী বরা বলি খান।
তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, পাই না ব্রাহ্মণ,
করো না করো না ভাই ! প্রতিমা গঠন।

৩

ভক্তিতে করিবে শক্তি-পূজায়োজন,
নাই রৈল তন্ত্র-মন্ত্র, পূজক ব্রাহ্মণ ?—
মন্দ কথা নয় ; কিন্তু সন্ধ বড় হয়—
সত্যি কি ভক্তিতে তুমি ব্যাকুল-হৃদয় ?
রেগো না, চটো না ভাই ! ধৈর্য্য কর রক্ষে,
প্রাণের কাঁদুনি গাই, তোমা উপলক্ষে।
সাত্ত্বিকী না হোক, ভক্তি হউক রাজসিকী—
ধনং দেহি, পুত্রং দেহি—বলিতে ক্ষতি কি ?—
কিছুমাত্র নাই ; কিন্তু সে ভক্তি হৃদয়ে
আছে কি হে তব, যাতে কামনা পূরয়ে ?

৪

সুরত-সমাধি নামে ছিল আদিভক্ত,
দিয়াছিল বলি তারা নিজ গাত্র-রক্ত ;

রাজসী পূজায় রাম চক্ষু উপাড়িল—
ভক্তি-পরীক্ষায় পাস তবে ত হইল।
কি শিক্ষা পেয়েছ ভাই? কি পরীক্ষা দিবে?
কাগজের প্রশ্ন নহে—কলমে সারিবে।
শক্তি নাই—রক্ত তুমি কি রূপেতে দিবে?
অন্ধ তুমি,—চক্ষুদান কেমনে করিবে?
অভক্ত অশক্ত অন্ধে রাজসী পূজার
বিধান কখন নাহি দেন শাস্ত্রকার।

৫

তবে তামসিকী?—পথে এস হে এখন,
তামাসার জন্য কর প্রতিমা গঠন।
আচ্ছা যাও লেগে! গঠো তবে তামসী প্রতিমা,
খুব সাজাও, খুব বাজাও, গাও হে মহিমা;
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, তুলি উচ্চ রোল,
জমক চমক সাজে কর গণ্ডগোল।
উড়াও নিশান লাল—বাঁধ' নহবত,
'দিলে না', 'দিলে না' বোল্ বল অবিরত;
দীপ ধূপ ধুনা ধূম পাঞ্জাবী গুগ্‌গুল,
চাল কলা গঙ্গা জল পত্র ফল ফুল—

৬

আর লুচি, শুভ্র রুচি, চন্দ্রার্ক আকার,
অখণ্ড মণ্ডলাকার মণ্ডা নাম যার,

ফৌল্‌করি নাহি হয়—কৌল করি হ'ল,
রাউতা রাব্‌ড়ি তায় চাট্‌নি যদি র'ল,
আর আর—তামসী পূজা বটে—তামাসা ত নয়,
রাজসীর বীর-বস্তু ইথে যেন রয় ;—
যে-বলে মহিষাসুর-মর্দ্দিনী চণ্ডিকা,
সে বল নহিলে ভাই ! সকলি ফক্কিকা ;
'শীতলে' বোতল দাও ডজন ডজন—
তবেই ত প্রতিমার বাড়িবে ওজন।

৭

দক্ষিণ কড়চে আগে প্রণামীটি লবে,
'আসিতে হউক আজ্ঞা'—তারপর কবে ;
বসিতে আসন দিয়া দেখাবে প্রতিমা,
ঝাড়-বুটি খুঁটিনাটি—যতেক মহিমা ;
"সহরের কারিগর গঠেছে এমনি—
দেবী যেন ক্লিওপেট্রা—মিশর-রমণী ;
বিলাত হইতে চুম্‌কি হয়েছে ইণ্ডেণ্ট,
দাঁয়েদের, এ বাড়ীর—একই প্যাটেণ্ট।"—
এমনি করিয়া সব বুঝাবে দর্শকে,
তবে ত জাঁকিবে পূজা জমকে চমকে।

৮

প্রণামী গণিয়া পরে পাতাইবে পাত,
অপ্রণামী লোকে যেন বায়নাক সাথ ;

কাহারো সম্মুখ দিক্, কাহারো নেপথ্য,
যে যেমন, তারে সেই ভাবে লবে তথ্য ;
প্রণামীতে প্রসাদেতে রাখিবে সমতা,—
তবে ত প্রতিমা 'পরে হইবে মমতা।
এরূপ যগুপি হয় পদ্ধতি পূজার—
তবেই এ দেশে হয় প্রতিমা-প্রচার ;
হবে ঘটা, নব ছটা, মহা ধূমধাম,
নায়কের যশ হবে,—গায়কের নাম।

৯

সাত্ত্বিকী রাজসী ভাবে যদি থাকে মন,
করো না করো না ভাই ! প্রতিমা গঠন।
কাঠ বাঁশ খড় দড়ি তুষ মাটি রঙ্,
জড়' করি করিবে হে শুদ্ধমাত্র সঙ্ ;
কুরসী গহনা গড়ি আরসী বসাবে,
কল্‌কায় শিখিপুচ্ছ অবশ্য লাগাবে ;
ঢাক ঢোল বাজাইবে, করতালি দিবে,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কিন্তু করিতে নারিবে।
না হইবে পূজা-হোম, না মিলিবে মন্ত্র,
শুদ্ধ আড়ম্বর মাত্র—ফকিকার তন্ত্র !

পুনঃ পুনঃ বলি তাই আগ্রহ-বচন—
করো না করো না আর প্রতিমা গঠন।

একান্ত-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বৈশাখ, ১২৯৭] [প্রতিমা—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা

"সাহিত্যে যিনি আমার গুরু, আর সাহিত্যের যিনি একজন প্রধান গুরু, তাঁহাকে প্রতিমার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ তাঁহার লেখা হয় নাই, সেই কথা জানাইয়া পদ্যে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি অবিকল প্রকাশ করিলাম। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে কবিতা বা কান্নার উচ্ছ্বাস আসে কেন, পত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালি পাঠক যদি একথা বুঝেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীপ্রতিমা-সম্পাদক।"

১৯

সম্পাদকের নানা জ্বালা*

সম্মার্জনী-হস্তে অবগুণ্ঠণাবৃতা জগদম্বা আসীনা ও স্বগতা।

আজ তোমারই একদিন আর আমারই একদিন। ডেক্‌রা—যদি চিরকাল উপহাস্যই ক'র্‌বি, তবে সাত-পাকের ফের দিয়ে ঘরে আন্‌লি কেন? একবার এলে হয়—

(জলধরের প্রবেশ)

---

* সাধারণীর (১৭ই চৈত্র, ১২৮০) "পত্নীভক্তি ও পত্নীভয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী", দ্বিতীয় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে জগদম্বার উক্তি—"আজ তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন; এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মার্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

পত্নীভক্তি ও পত্নীভয় প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।—

'পত্নীভক্তি আধুনিক বঙ্গসমাজের লক্ষণ বলিয়া আমরা নির্দেশ করি নাই,—পত্নীভয়ই এ সমাজের লক্ষণ। * * * অনেক সুন্দরী মনে করিবেন যে, বঙ্গীয় যুবকগণ তাঁহাদিগকে ভয় করেন, ভক্তি করেন না বা ভালবাসেন না,—এ কথা বলিয়া তাঁহাদিগের মিথ্যা অবমাননা করিলাম। * * * তাঁহাদিগের প্রতি যদি পুরুষদিগের ভক্তি বা প্রণয় থাকিত, তবে রোদন, মস্তকে করাঘাত, মান, তিরস্কার প্রভৃতি যে সকল উপায়ের দ্বারা এক্ষণে নিজ নিজ আজ্ঞা প্রচলিত করেন, তাহার কিছুরই আবশ্যক হইত না। এ সকল মহায়ুধ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হয় বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে,—এ ভয়, ভক্তি নহে। * * * আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যে, তাহারা চোখ ঘুরান' 'নথনাড়া, ঠোঁট-ঝুলান', এবং জোর-জুলুম একটু খাট করুন। আর বাঙ্গালি বাবুদিগকে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। তাঁহারা নথের ভয়ে অস্থির—যখন বন্দুক ধরিবেন, এ ভরসা যেন করেন না। ঝাঁটা দেখিয়া যাঁহাদের হৃৎকম্প হয়, ইংরাজের লাথি তাঁহাদের অসহ্য কেন?'

জগদম্বা। (উঠিয়া জলধরের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক) বড় ঝাঁটার খোয়ার হচ্ছিল কেন ?

জলধর। অ্যাঁ-অ্যাঁ, তুমি কোথায় ছিলে ? (স্বগত) সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !

জগ। আমি যে মাঝের কুঠ্রির কবাটের আড়াল হ'তে সব শুন্‌ছিলাম। কে কি খবরের কাগজে লিখেছে, তাই নিয়ে আমাদের এত খোয়ার ! বলেন, 'যা লিখেছে তা মিথ্যে নয়, পেত্নী-ভয়েই আমরা মারা গেলাম।' হাঁ ডেক্‌রা ! আমরা পেত্নী, পোড়ার মুখ ! তা হ'লে তোমরা যে ভূত হ'লে। (কেশাকর্ষণ করিয়া সম্মার্জনী প্রহার-পূর্ব্বক) আজ এই নারিকেল মুড়োর চোটে তোমার ভূত ছাড়াব।

জল। বাবা রে গেলাম রে ! মলাম রে !

জগ। তুমি ম'লে ত আমার কি ? তুমি কি আমায় ভালবাস ! খালি ভয় কর ; (প্রহার) খালি ভয় কর। (প্রহার)

জল। না না ভালবাসি, ভক্তি করি।

জগ। ভালবাস ত, পোড়ার মুখ, ওর একটা জবাব দাও না—তুমি পোড়ার মুখ খবরের কাগজ লেখ, এর একটা জবাব দিতে পার না ?

জল। (হাঁপ ছাড়িয়া শশব্যস্তে) এই লিখি—এই লিখি ; (পৃষ্ঠে হস্ত দান করিয়া) উঃ কাঠিগুলা ফুটে রয়েছে, যেন বিছার কামড়ের মত জলছে।

জগ। ও বিছের কথাটা আবার কি হচ্চে ? (সম্মার্জনী পুনর্গ্রহণ) পোড়ার মুখ লেখ না, লেখ না। বিছার কথা ভাব্‌লে কি হ'বে ?

জল। এই বিছার কথাই লিখ্‌ছি, দেখ দেখি,—

"সাধারণী-সম্পাদকের অদৃষ্টে যদি পত্নীর কোমল-করপল্লব-তাড়িত শতমুখীর বৃশ্চিক-দংশন-বিনিন্দিত আঘাত-পরম্পরা কিঞ্চিদতিরিক্তরূপে ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহার জন্ত আমরা দুঃখ করি বটে—"

জগ। আবার বুঝি আমারই খোয়ার হচ্চে ?

জল। তোমার কি কোমল কর-পল্লব ? (স্বগত ; জিহ্বা কাটিয়া)—কি সর্ব্বনাশ কর্‌লাম !

জগ। সে আবার কি ?

জল। বলি, (অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন) বলি—তোমার হাত কি পাতার মত শাকপানা, তোমার হচ্চে ও দুধে আল্‌তা মাথান' হাত—

জগ। তুমি ডেক্‌রা আমায় ফাঁকি দিচ্চো ; তবে এতক্ষণ চুপ ক'রে রইলে কেন ?

(সম্মার্জনী পুনগ্র্রহণ)

জল। সাত দোহাই তোমার—এখন ফুলেছে, আর মেরো না ; তখন টাট্‌কা টাট্‌কা যার উপর ঘা হচ্ছিল, এখন মার্‌লে বড় লাগ্‌বে। আমি শুধু তোমার ভয়ে চুপ ক'রে র'য়ে ছিলাম।

জগ। (প্রহারপূর্ব্বক) আবার বলে ভয়ে, আবার ভয়ে ?

জল। না না, তোমার প্রতি ভক্তিতে চুপ ক'রে ছিলাম।

জগ। তবে রে পোড়ার মুখ, তুমি একেবারেই ভয় কর না !

জল। (স্বগত) বিষম বিপদে পড়্‌লাম। (ক্ষণেক পরে, প্রকাশ্যে) ভয়ও করি ভক্তিও করি—ততটুকু ভয় করি, যতটুকু তোমার প্রতি ভক্তি বজায় রাখিবার পক্ষে আবশ্যক।

জগ। (সম্মার্জনী ত্যাগ করিয়া) ঐ টুকুও লেখ।

জল। এই লিখি। (লিখিতে লাগিলেন; জগদম্বার খর-দৃষ্টি-ক্ষেপক করিতে করিতে প্রস্থান।)

—ভাগ্যি একটু উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল, তাই আজ জগদম্বার হস্তে রক্ষা পাইলাম। এখন লেখনি, তোমার বলে সাধারণে লজ্জা রক্ষা হইবে।

(পটক্ষেপ)

৭ বৈশাখ, ১২৮১] [সাধারণী—২ ভাগ, ২৬ সংখ্যা

২০

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' কলিকাতায় অভিনীত হইবার পর, 'বিষবৃক্ষ' অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগের এই নগরীতে সভা হয়। কিন্তু ম্যানেজার ও কয়েকজন প্রধান সভ্যের বিবেচনা মতে কেবল বিষবৃক্ষের অভিনয় না করিয়া, একেবারে "বঙ্গদর্শনের" অভিনয় করাই স্থির হইয়াছে। 'সাধারণী' বঙ্গদর্শন-যন্ত্র * হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া এই অভিনয়-ক্রিয়ার বিস্তারিত বিজ্ঞাপন আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছি ; নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

বেরি গ্রেট হিন্দু ন্যাসানেল

থিয়েটার।

চুঁচুড়া-বারিক।

২০শে পৌষ, শনিবার।

বঙ্গদর্শন-অভিনয়।

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

প্রথমে "সঙ্গীত" আসিয়া "বাহু-মিলন" গান করিবেন। শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইবে। "উদ্দীপনা" বিস্ফারিত বক্ষে ঊর্দ্ধনেত্রে

---

* সাধারণীর ১ম সংখ্যা (১১ই কার্ত্তিক, ১২৮০) হইতে ২ ভাগ ১৪ সংখ্যা (৪ঠা শ্রাবণ, ১২৮১) পর্য্যন্ত কাঁটাল পাড়া, বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রবেশ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পর, "স্ব-স্ব-ভাবানুবর্ত্তিতা", "বঙ্গদেশের কৃষক" কথোপকথন আরম্ভ করিবেন। এই কথোপকথন অতি সুমধুর হইবে।

পরে

সম্মার্জ্জনী-হস্তে "সমালোচনার" প্রবেশ। "সমালোচনা" ভৈরবী মূর্ত্তি। বাম পার্শ্বে একজন কেরাণী, দক্ষিণে একজন শস্ত্রধারী পুরুষ। "সমালোচনা" ইঙ্গিত করিতেছেন, কেরাণী কি লিখিতেছেন, আর শস্ত্রধারী পুরুষ অগ্র-পশ্চাতে শস্ত্র-চালনা করিতেছেন। এরূপ বীর রসের অভিনয় আর কখনই হয় নাই।

পরিশেষে

প্যাণ্টোমীম্

"ব্যাঘ্রাচার্য্য", "শ্রীমন্মহামর্কট", "বাবু" ও "গর্দ্দভ"—এই চারিটি পশু একত্র মিলিয়া কৌতুক-জনক নৃত্য করিবেন। এরূপ হাস্য রস কেহ কখন দেখে নাই।

শ্রীপাপদাস অসুর,
ম্যানেজার।

চুঁচুড়া।

১৪ পৌষ, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ১০ সংখ্যা

প্রসিদ্ধ নাট্যমধ্যাক্ষ ধর্ম্মদাস সুর তখন "গ্রেট ন্যাসানেল থিয়েটারের" ম্যানেজার ছিলেন।

২১

বিষম বাজার

বা

সম্মার্জ্জনী-মেলা

ইংরাজের কল্যাণে,—আর কল্যাণেই বা কেন বলি,—ইংরাজের কৃপায় আমরা কত কি না দেখিলাম, আর কত কি না দেখিব! রাজ্যে দেখিলাম—ভূমিশূন্য রাজা, জমিশূন্য প্রজা। কার্য্যে দেখিলাম—যিনি কাপুরুষ, তিনি বাহাদুর; যিনি সা-পুরুষ, তিনি দূর দূর। রাজায় দেখিলাম—বিচার-বিক্রয়, শাসন-বিক্রয়, শাস্তি-বিক্রয়; দান—কেবল আধি-ব্যাধি, উপাধি আর সমাধি। নগরে দেখিলাম—সরমহীনা কুলনারী, আর ধর্ম্মহীনা পাদরী। দেশে দেখিলাম—যবন হিন্দুর সমাজ-সংস্কারক, আর হিন্দু হিন্দুর সর্ব্বনাশক। ভারতে দেখিলাম—জলে বাষ্পবোট, স্থলে রেল-রোড, সিন্দুকে ব্যাঙ্ক-নোট, আর সর্ব্বত্র অনবরত হরির লুঠ। সভায় দেখিলাম—দেশভক্ত রিজোলিউশন করে, রাজভক্ত সার্টিফিকেট জারি করে, আর প্রজাভক্ত প্রজার রক্ত শোষণ করে। সহরে দেখিলাম—নাস্তিকতায় তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্ম্মকথায় বিজ্ঞানী, অনাচারে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্যবসাদারিতে হিন্দুয়ানি। ভিতরে দেখিলাম—সধবার নিগ্রহ, বিধবার আগ্রহ, আর বহুধবার অনুগ্রহ। বাহিরে দেখিলাম—আল্‌তা-পায়ে

জুতার চটক, বুড়া নাকে নলক-দোলক, ঘড়ির উপর 'বডি', আর বগির উপর জগদ্ধাত্রী। সহরের হাটে দেখিলাম—উস্‌নায় * গুঁড়ি, আতপে খড়ি; দুধে জল, ঘিয়ে বাতি; লবণে হাড়, বসনে মাড়; সন্দেশে ময়দা, বারুদে কায়দা। গড়ের মাঠে দেখিলাম—হাতীর লীলা, ঘোড়ার খেলা, আর লোকের রেলা। ও দিকে ব্যাপারটা কি? একজন মুসলমান বলিল,—"ঝাঁটার মেলা।"

সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম—বৃহৎ তোরণের উপর চল চল লাল কাপড়ে বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে ছাপা আছে,—

BESOM BAZAR

বিষম বাজার

বুঝিতে পারিলাম না। তোরণের এক পার্শ্বে, ভূমি হইতে তিন হাত ঊর্দ্ধ একটি ছোট গবাক্ষদ্বার দিয়া, একটি ফুট্‌ফুটে খুদে বিবি মেজেন্টি ঠোঁটে উঁকি মারিতেছেন। আমায় কিছু বিস্মিত দেখিয়া, তিনি ইংরাজিতে বলিলেন, "বাবু ভিতরে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, আসুন।" আমি একটু কুণ্ঠিত অথচ প্রফুল্লভাবে বলিলাম,—"আপনি কৃশাঙ্গী, বরং এই ঘুল্‌ঘুলি দিয়া বাহিরে আসিতে পারেন, আমার এই দেহ লইয়া এই পথে আপনার নিকটে যাওয়া অসম্ভব।" রমণী কোন কিছু না বলিয়া, ছোট হাতখানি গবাক্ষ দিয়া আমার নিকট ধরিয়া বলিলেন, "টাকা"। আমিও অমনি কলের পুতুলের মত বুকের জেব্ হইতে

---

* ধান অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া, পরে শুকাইয়া ও ভানিয়া যে চাল তৈয়ার হয়, তাহাকে উস্‌না বা উক্‌না বলে।

একটি টাকা তাঁহাকে দিলাম। মনে মনে বলিলাম—"শুভমস্তু"। রমণী তৎক্ষণাৎ একটি শাদা ক্ষুদ্র কুঁচি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—"ঐ সাহেবের গালে ইহার বাড়ি মারিলেই তিনি আপনাকে ভিতরে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিবেন।" বলিয়া—'সম্বন্ধ দক্ষিণাবধি' এই কথা বুঝাইবার জন্যই যেন আমার প্রতি বিমুখী হইলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সাহেবের দিকে চাহিলাম। দেখি—বিবি যেমন ফুট্‌ফুটে, ছিপছিপে,—সাহেব তেমনই বিরাট, বীভৎস। দুটা কামানের উপর একটা ঢাকাই জালা, তার উপর একটা ঢাকাই জালা, তার উপর একখানা জীবন্ত মুখস্। সাহেব হাসিতেছেন, কি হাই তুলিতেছেন,—তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পাশে রাস্তার দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম, আমি সহস্র-চক্ষুর লক্ষ্য হইয়াছি। হস্তস্থিত শ্বেত কুঁচিটি আর একবার দেখিলাম। বুঝিলাম সেটি হাতীর দাঁতের কুঁচিকাটি—অতি পরিপাটী। ধরিবার হাতলে অতি ছোট অক্ষরে লেখা আছে,—

Besma = Besem = Besom = Broom.

বিষমা, বিষেম, বিষম, ব্রূম।

তখন সেই যে বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়াছিল, ঝাঁটার মেলা,—সেই কথা মনে পড়িল। রাক্ষস সাহেবের গালে বিলাতী ঝাঁটা মারিতে হইবে,—ভাবনা হইল। আবার পার্শ্বের দিকে চাহিলাম—তখনও সকলে আমাকে সেই ভাবে দেখিতেছে। আস্তে আস্তে সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলাম। আস্তে আস্তে সাহেবের গালে ঝাঁটা মারিলাম। সাহেব বলিলেন,—'এক'। আবার মারিলাম, সাহেব বলিলেন,—'দুই'; পুনরায় মারিতেই, সাহেব 'তিন' বলিয়া আমার হস্ত হইতে কুঁচিকাটিটি গ্রহণ করিলেন।

একটা কাটা দরজা কট্ কট্ রবে খুলিয়া গেল। আমি মেলার ভবনে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমে কতকগুলি নারিকেল-তালজাতীয় বৃক্ষ, নল-খাগ্ড়ার বন, বেণা-কেশের ঝাড়, ঝাঁটির ঝোপ, বড় বড় ঘাসের কেয়ারি। স্থানটি অতি পরিপাটী করিয়া সাজান'। সারি সারি সুপারি গাছ থামের ছড়ের মত বসাইয়াছে, পাতায় পাতায় বিনাইয়া দিয়া খিলান করিয়া দিয়াছে; দু'পাশে দূরে আবার নারিকেল, তাল, সাগুগাছের সারি বসাইয়াছে। মাঝে মাঝে বেতের কুঞ্জ, শরের গুচ্ছ; আর নানাবর্ণের ঝাঁটি ফুল চারিদিকে রাশি রাশি ফুটিয়া আছে। একজন বাবু আপন মনে বলিয়া গেলেন—"এই ত ঝাঁটার সূতিকাগার।" কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হইল, তবে ত ঝাঁটার অদৃষ্ট আমাদের চেয়ে ভাল। আমাদের সূতিকাগারের কথা ভাবিলে মনে হয় আমরা নিতান্ত দৈবী শক্তিতেই বাঁচিয়া আছি।

ক্রমে অগ্রসর হইলাম। একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপনীত। ঝাঁটা, ঝাঁটা, ঝাঁটা—চারি দিকেই ঝাঁটা, কোঁচ্কা, কুঁচি, বাড়ন্, ক্রস ও ব্রূম। থামে ঝাঁটা, দেওয়ালে ঝাঁটা, খিলানে ঝাঁটা। যে বড় বড় দাণ্ড-লাগান ব্রূম্ দিয়া কলিকাতার সদর রাস্তার পাশগুলা ধুইয়া দেয়, তাহাই দেওয়ালে সাজাইয়া কারিগরি করিয়াছে। ঝাঁটা সাজাইয়া বর্ণমালা করিয়াছে, খড়্কের কোঁচ্কাগুলা মাকড়সার মত করিয়া বাঁধিয়া বাহার করিয়াছে। সম্মুখে সমগ্র পশ্চিম দিকের দেওয়াল জুড়িয়া একখানি বিচিত্র চিত্রপট। সেই দিক্টা একটু অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রপটে সুনীলপটে ছোট বড় তারকাগুলি জ্বলিতেছে, আর সেই বিচিত্র পটের নীচে হইতে উপর পর্যান্ত কোণাকুণি একটি বৃহৎ ধূমকেতু

ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। পটের উপরে লেখা আছে—"স্বর্গীয় সমার্জনী।" তখন ঠাকুমা আমাকে ছেলে বেলা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল ;—বলিতেন, "ঐ যমের ঝাঁটা উঠিয়াছে রে! কোন্ দেশের লোককে এবার ঝাঁটিয়ে লয়ে যাবে। প্রণাম কর্।" তখন প্রণাম করিতাম। এখনও এই অপূর্ব্ব চিত্রপট দেখিয়া স্বর্গের ঝাঁটাধারীকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। তাহার পর নানাবিধ সম্মার্জ্জনী দেখিতে লাগিলাম।

প্রথমেই কতকগুলি রাজনৈতিক ঝাঁটা ; তাহার সর্ব্বপ্রথমে রেসিডেণ্টি সম্মার্জনী। একটু বাঁকাভাবে ওঁচান আছে ; নীচে কেবল লেখা আছে,—"Beware of the Engine."—"গাড়ী যাতায়াত করে, সাবধান !!!" সেই স্থানে আর একটি সম্মার্জনী দেখিলাম। উপরে নাম দেওয়া আছে—'কাশ্মীরী'। কাশ্মীরী থেম্‌টাই জানিতাম—এইবার কাশ্মীরী ঝাঁটা দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। হাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিলাম, সেটি ঝাঁটি-শাখার ঝাঁটা, কিন্তু শালের হাঁসিয়া দিয়া বাঁধা। নীচে লেখা আছে,—'বাঙ্গালি বিচালনে অনন্ত শক্তি।'

এই স্থলে একগাছি সম্মার্জনী রহিয়াছে, তাহার নাম 'করময়ী।' তাহাতে সহস্র শিখা ; রথ-কর, পথ-কর, আয়-কর, ব্যয়-কর, বিচারের কর, অত্যাচারের-কর, শাসন-কর, শোষণ-কর, লবণ-কর, জল-কর, বায়ু-কর, জীবন-কর—নানাবিধ কর-শিখা অমনই থর্ থর্ করিতেছে। নীচে লেখা আছে,—"ইহাতে ধূলিগুঁড়ি কিছু এড়াইতে পারে না।"

এক গাছির নাম 'দণ্ডশাসনী।' তাহার কাঠিগুলি শাদা শাদা, কিন্তু গোড়ায় লাল, যেন রক্ত-মাখান'। পরিচয়-স্বরূপ লেখা আছে,—

"তদ্বিরে মিলিবে মুক্তি, তর্কে বহু দূর,
বে-তদ্বিরে শ্রীনিবাস, বুঝিবে চতুর।"

'সিবিল-সর্ব্বিস্-সম্মার্জনীর' শলাগুলা কেবল কাঁটায় পুরা। কোনটি বয়সের কাঁটা, কোনটি ভাষার কাঁটা, কোথাও জাহাজের কাঁটা, কোথাও বর্ণের কাঁটা,—কেবল কাঁটা। পরিচয় আছে,—

"কণ্টকে গঠিল বিধি সর্ব্বিস্ উত্তমে।
অকূলে রাখিল তারে, বুঝিয়া মরমে ॥"

তাহার পর কতকগুলি ঔপন্যাসিক ঝাঁটা।

এ স্থলে ঝাঁটাগুলি মূর্ত্তিমন্ত করিয়া রাখিয়াছে। আর দলে দলে বাঙ্গালিবাবুরা আশে পাশে ঘুরিতেছেন। দু'পাশে বনাতের পর্দা দেওয়া, সুমুখে খোলা, এক একটি কুঠ্রির মত; তাহারই মধ্যে এক একরূপ সম্মার্জনী-লীলা। একটি প্রকোষ্ঠে একজন একহারা ছোক্রা—পায়ে পম্পচটি, মাথায় নেয়াপাতি সিঁথি, গায়ে একখানি লুই—পৈতার মতন ভাবে এড়ো করিয়া দেওয়া; বাঁকা হইয়া পীঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—আর পার্শ্বে একটি কালো কালো বৈষ্ণবের মেয়ে—কপালে উল্‌কি, কানে দুল, পরণে কস্তাপেড়ে সাড়ী, গায়ে কাঁচুলি, শুক্‌নো-গোবর-গোলা-মাখা একগাছ মুড়ো ঝাঁটা হাতে, সেই প্রস্তুত পীঠের উপর লক্ষ্য করিয়া আছে। উপরে লেখা আছে,—"দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া"; নীচে লেখা আছে,—"প্রেম নানা প্রকার।"

আমি এক মনে গিরিজায়ার সম্মার্জনী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, এমন সময় আশ্‌পাশ দিয়া কয়জন থিয়েটারের বাবু হঠাৎ আমাকে "মহাশয় যে" বলিয়া নমস্কার করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিলম্বে প্রতি-নমস্কার

করিলাম ; বলিলাম—"এই দেখিতেছি।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিতেছেন ?" আমি বলিলাম, "দিগ্বিজয় কিছু হালি ধরণের হইয়াছে।" দিগ্বিজয় আপনই বলিয়া উঠিল, "নহিলে মহাশয় ! এ মুড়ো ঝাঁটা পীঠ পাতিয়া আর কেহ কি লইতে পারে ?" গিরিজায়া হাসিয়া উঠিল ; আমি বিরক্ত হইয়া একটু সরিয়া গেলাম।

দেখি—'জলধর-জগদম্বা।' জগদম্বা সোনার কঙ্কণ হাতে দিয়া এক খানি মটুরা চেলী ঘোড়বেড় করিয়া পরিয়া এক বিরাট সম্মার্জনী হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মার্জনীতে বড় টিকিট লাগান' আছে,—"লম্পট-দমনী।" জলধর ছিলেন, আমি আসিবার পূর্ব্বেই কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ (বোধ হয় সকলেই বাঙ্গালি) তাঁহাকে খুঁজিতে ও ডাকিতে লাগিলেন।

এক প্রকোষ্ঠে রৈবতকের সুলোচনার সম্মার্জনী। সুলোচনা সুভদ্রার সহচরী। হাতে তাড়, বাজুবন্দ ; কানে সোনার মুচকুন্দ ; একখানা পাঁচ-রঙ্গা সাড়ী সুমুখটা ঘাঘ্‌রার মত করিয়া খানিক গোঁজা, আর খানিকটা বুকের ফতুয়ার উপর দিয়া ঘাড় বেড়িয়া কোমরে জড়ান' ; তাহার উপর নীল রেশমী ওড়্‌না। গড়নখানি মাটো মাটো, নাক টীকল', মুখখানি ছাঁচি পানের মত ; কথা কহিলে জিহ্বাটি টং টং করিয়া বাজিতে থাকে। পশ্চাতের লাল পরদায় শ্বেত অক্ষরে এই পদ্যটুকু অঙ্কিত আছে,—

"কৃষ্ণ। গালি দিস্, বিষমুখি, টানি বজ্র-জিহ্বা তোর,
সাজাইব অনার্য্যের কালী।
সুলোচনা। বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মনোসুখে,
রণরঙ্গে দিয়া করতালি।

ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র-কোণে.
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ-পরিসর
ইচ্ছা করে দেখি বুক-পাটা।”

[শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত “রৈবত ।”]

সুলোচনার হস্তে সম্মার্জনী; হাঁ, ঝাঁটা বটে! বেণা গাছের ঝাঁটা; বেণার শিকড়গুলি পাকাইয়া একটি ছোট খোঁপার মত ঝাঁটার গোড়া করিয়াছে। তাহার সুগন্ধ বাহির হইতেছে। হ'লে কি হয়,—উপরের শলাগুলি এক একটি যেন বাঘছপ্‌টি! অমনই লক্ লক্ করিতেছে। মনে করিলাম, ইহারই এক গাছি পাই ত, বড় বৌয়ের হাতে দিয়ে শম্ভুদাদার রাত্রিবেলা ক্লাবে যাওয়া ঘুচাই।

একটি কুঠ্রিতে, মধ্যে একটি পুরুষ যোড়পদে, নিশ্চলভাবে, দুই হস্ত সমানভাবে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান,—দু'গাছা ঝাঁটা কেবল দু'পাশ হইতে ওঁচান রহিয়াছে; সম্মার্জনী দুই গাছির অধিকারিণীদের মূর্ত্তি নাই। নিম্নে লেখা আছে, “চোর-নিবারণী দুই-সতিনী সম্মার্জনী।” পার্শ্বে এক কোণে, কালি-ঝুলি-মাখা, টেনা-পরা একটা লোক যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আমি নিকটস্থ হইবামাত্র সম্মার্জনী-মধ্যস্থ বাবু মুখ না বাঁকাইয়া, না হেলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঐ চোর! চোর!” লোকটা কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে বলিল, “প্রভু, আমি চোর, উনি সাধু!”

কিছু দূরে একগাছি বড় উলুর বাড়ন। বাড়নের গোড়ায় পরিষ্কার করিয়া উলু বিনাইয়া বেশ একখানি সুন্দর মুখ গড়িয়াছে; তাহাতে

ক্ষ, ভ্রূ আঁকিয়াছে, নাকে একটি ক্ষুদ্র মুক্তার নোলক দিয়াছে। কিন্তু মাথার উপর লিখিয়া দিয়াছে—"উপরে নীচে দেখিয়া কার্য্য করিবে।"

এক দিকে কতকগুলি প্রকোষ্ঠে ঐতিহাসিক ব্যাপার। দুইগাছি তাহার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ; লোকে দেখিতেছে, পড়িতেছে, হাসিতেছে, কত কি বলিতেছে। এক গাছির নাম "দরিয়ার নারিকেলী বা সাগরী সম্মার্জনী।" আর গাছির নাম "নদীয়ার নারীকেলি বা নাগরী সম্মার্জনী।"

সাগরী সম্মার্জনীর কিছুই বৈশেষিকত্ব দেখিলাম না। এই সাধারণ ঘরকন্নার ঝাঁটাই বটে। বার্-ফট্‌কা পুরুষগুলার অদৃষ্টে বা পৃষ্ঠে ঐ রূপই বটে;—তবে এবার আধারের গুণে আধেয়ের কিছু অধিক গৌরব হইয়াছে। গৃহ-মধ্যে কেবল ঝাঁটাই বিরাজমানা—পৃষ্ঠপাতক কেহই নাই, তবে পরদার উপর পূর্ব্বমত কয়েক পংক্তি গদ্য চিত্রিত আছে,—

'আমার স্ত্রী কোন ক্রমেই নির্ব্বোধ নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে,—আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেন।—আর কি করেন, তা ইনিই জানেন।—সম্মার্জনী-সংগ্রাহক।'

[ভ্রান্তিবিলাস, উপাখ্যান ভাগ—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সঙ্কলিত।]

নদীয়ার নারীকেলি বা নাগরী সম্মার্জনীও সাধারণ ধরণের। তবে শুনিলাম, এবার আধারের গুণে নহে ধারিণীর গৌরবে সম্মার্জনী গৌরবান্বিতা।

এমন ঐতিহাসিকী সম্মার্জনী—বাঁকা, টেরা, ঝুলান', দোলান' যে কত রহিয়াছে, তাহা গণিতে পারিলাম না—বিশেষ কৌতূহলও হইল না।

সংস্কারণী সম্মার্জনী-মধ্যে 'সুরাবারিণী' অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। কাঠিগুলি বেউড় বাঁশের শলা—তবে আগাগোড়া ক্লোরাইড্ মাখান। বড় দুর্গন্ধ। মনে করিলাম ঝাঁটাতেও হোমিওপ্যাথি আছে নাকি—Like cures like ?

'সভা-নিবারণী' ও 'বক্তৃতা-বারিণী' সম্মার্জনী—উভয়েই নূতন আবিষ্কৃত। যুবতীরা স্বয়ং ক্রয় করিলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। মনে করিলাম, এখন অর্দ্ধমূল্য, পরে অবশ্য উপহার হইবে; সেই সময়ে কোন আত্মীয়াকে সঙ্গে আনিতে পারিলে চলিবে। তবে বিশেষ আত্মীয়াকে আনা হইবে না—কাজ কি, শেষে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিব কি ?

তাহার পর "মূল-দোষ-নিবারণী" অনেক প্রকার সম্মার্জনী দেখিলাম। মূলের মধ্যে নানা প্রকার আলুই বেশী। কিন্তু আর ঘুরিতেও পারিলাম না। পরদার চিহ্নিত গদ্য-পংক্তি কয়টি মনে পড়িতে লাগিল। বার-দেশের বিরাট সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদে বিবিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

পৌষ; ১২৯৩] [নবজীবন—৩য় ভাগ

২২

চনকচূর্ণ

(চুঁচুড়ার সং)

কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, আমরা চুঁচুড়া-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখি, তাহা সাধারণের অপাঠ্য হইয়া উঠে। কথাটিতে বিশেষ উপকার আছে, আর নূতন কথাও বটে,—তবে কি জানেন্—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" একেবারে মায়াটা কাটাইয়া উঠিতে পারি না,—তাই আজ পাকেচক্রে এই চনকচূর্ণ-মধ্যেই চৈত্রের চুঁচুড়ার সং চড়াইয়া দিলাম। বিদেশী পাঠক রাগ করিবেন না,—এটি পড়িবেন। না পড়েন ত, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যে ঘুম সেই ঘুমের দিব্য,—আপনার ছাপর খাটের ঝালর-লাগান' মশারির দিব্য,—আর কাল্‌কের পাত্রভোজের মিঠায়ের দিব্য। যদি না পড়েন, তাহা হইলে ঘুমের সময় পুঁটীর মা দাসী আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে, রাত্রিতে মশারির ফাঁক দিয়া তিনটি মশা প্রবেশ করিবে এবং কাল পাত্রভোজে সকল স্থানেই টাকা পাঠাইবেন, কোথা হইতেও মিঠাই বাড়ী পৌঁছিবে না।

আজ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর হইল চুঁচুড়ার সং উঠিয়া গিয়াছে। এবার বহু কষ্টে সেই সং পুনরাবৃত্ত করা হইয়াছে,—তেমন হয় নাই; কিন্তু

নিতান্ত মন্দও নহে। তবে তখনকার একরূপ কারখানা ছিল। পিতামহ-পর্য্যায়ের মহাশয়দিগের প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে যে, তামাকুর ধূমপান করিবার জন্য পাতার নল এত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিত যে, সংএর দ্বিতীয় দিনে পাতার নল একেবারে পাওয়া যাইত না,—রূপার পাতার নল করিয়া তামাক খাইতে দিত। তৃতীয় দিনে চীনের পাত সোনার নল করিয়া বড় বড় বাবুভায়েরা তামাকু খাইতেন। এখন সেরূপ বাবুভায়া কোথায় পাওয়া যাইবে? নবাববাবু পান খাইয়া থুথু ফেলিতেন—যেন খলে-মাড়া মকরধ্বজ ঔষধ বলিয়া বোধ হইত,—তাহাতে সোনা চিক্ চিক্ করিত। খালি সোনা-জরা, হীরা-জরা মিঠাই খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল, কাজেই থুথুও সেইরূপ নির্গত হইত। এখন সেরূপ বাবুও নাই, তেমন কাজও নাই,—সংও নাই।

তবু যা হউক পঞ্চাশ বৎসর পরে এবার একরূপ হইয়াছে। বলিতে হইবে না যে, আমরা ইহাতে বিশেষ লিপ্ত ছিলাম। তবে বর্ণনকালে সামান্য সম্পর্ক-শূন্য দর্শকের ন্যায় বর্ণন করিব; এরূপ না করিলে সংএর প্রশংসা করিতে লজ্জা বোধ হয়। সাধারণী স্ত্রীলোক,—চক্ষু-লজ্জাটা বড়।

১ম সং—এজ্‌লাশ

তিন দিকে তিন চক্—দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী; অন্য দিকে বৃহৎ বটবৃক্ষ, মধ্যমরাশি কয়েকটা বকুলবৃক্ষ ও এক সারি ছোট ছোট বিলাতী ঝাউয়ের গাছ। দেওয়ানী, কালেক্টরী একতালা, ফৌজদারী দোতালা। জজ সাহেবের এজ্‌লাশ—বোধ হয় দায়রা হইতেছে। এক দিকে সাত জন জুরী বসিয়া আছেন, মধ্য-জুরী স্থূলোদর, মাথায় হাতে-

বাঁধা পাগ্ড়ি। তিন জন জুরী—যেন হঠাৎ ঘুমের চট্কা ভাঙ্গিয়াছে,—এরূপ ভাবে চাহিয়া দেখিতেছেন। আর একজন—বোধ হয় আফিঙ্গের ঘোর নেশায় মাথা নেটাইয়া পড়িতেছে,—সংএর বেহারার এক দিকের দুইজন অপর দিকের দুইজন অপেক্ষা লম্বা হইলে, সং যেরূপ কাত হইয়া যায়,—সেইরূপ বঙ্কিম ভাবে উপবিষ্ট আছেন। মধ্য-জুরী ঈষদ্ধাস্য করিতেছেন।

জজ সাহেবের বাম হাত বাম দিকের প্যাণ্টালুনের পকেট-মধ্যে; দক্ষিণ হস্তে একখানি অর্দ্ধ উদ্‌ঘাটিত পিনাল কোড টেবিলের উপর ধরিয়া আছেন,—না উকীলদিগের দিকে, না জুরীর দিকে, একটু কোণাচে ভাবে বসিয়া আছেন; দক্ষিণ চক্ষু পিনাল কোডের উপরে, বাম চক্ষু একটি উকীলের উপরে। সেই উকীল বারে খাড়া আছেন। খাড়া আছেন বলিয়া সোজা দাঁড়াইয়া নাই; প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে হইলে বালকে ইষ্টক-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া যেরূপ ভাবে দণ্ডায়মান হয়, কেদারায় পা দিয়া সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; দাঁড়াইয়া অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া টেবিলের উপরি একটি মুষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই অঙ্গুষ্ঠের নখরের সহিত, তাঁহার নিজের নাসাগ্রভাগের সহিত এবং জজ সাহেবের নাসিকাগ্রভাগের সহিত ঠিক সমসূত্র,—এক রুজু। বোধ হয়, এই মুষ্টিযোগেই জুরীত্রয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকিবে এবং জজ সাহেবও দৃষ্টি দান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই মুষ্টিযোগেই যে মুহুরী মহাশয়ের ক্ষুদ্র টেবিল পর্য্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কেন না, মহুরী মহাশয়ের দোয়াত উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তিনি বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা মুছিতেছেন। বোধ হয়, এই বাবু সরকারী উকীল হইবেন;

কেন না, আর এক দিকে অপর তিনজন উকীল উপবিষ্ট আছেন; তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আসামীদ্বয়।

আসামীদ্বয় অতি শীর্ণ, রুগ্ণ ও ভগ্ন। বোধ হয়, ইহারা চৌর্য্যাপরাধে নীত হইয়া থাকিবে; কেন না, দুইখানা পুরাতন কোদালি বমালের মত করিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক এই আসামীদ্বয়ের মধ্যে একজন, তিনজন উকীলের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী মহাশয়কে যেন কি বলিবার জন্য কাঠ্‌রা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বস্থ একজন জুনিয়র উকীল আপনার মুখখানি জজ সাহেবের দিকে ঠিক সোজা রাখিয়া বামহস্তে আসামীকে নিবারণ করিতেছেন। অপর পার্শ্বস্থ আর একজন জুনিয়র আসামীর কথা ভয়ে ভয়ে শুনিতেছেন, মধ্যবর্ত্তী সিনিয়র মহাশয়ের খাতির নদারত, মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক কি কথা পেন্সিলে লিপি করিতেছেন। এজ্‌লাশের ভাব এইরূপ। লোকে পা টিপে পা টিপে গৃহ-মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে ও সকলেই, যে-উকীলবাবু বুড়ো আঙ্গুল উচ্চ করিয়া মেজের উপর কীল ঝাড়িয়াছেন, তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে।

এই সং দেখিলে কারিগরের প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়। যেখানে যা, সব যেন ঠিক ঠাক্। এজ্‌লাশ ঘরে প্রবেশ করিলে আর বোধ হয় না যে, সং দেখিতেছি—সত্য সত্যই যেন জজ সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়াছি,—টুঁ শব্দটি মাত্র নাই। কখন এরূপও বোধ হয় যে, উকীলবাবুর বক্তৃতাতেই সকল লোক এরূপ স্পন্দ-রহিত হইয়া গিয়াছে, রব-রহিত হইয়াছে ও আড়ষ্ট হইয়াছে। শেষে আপনিও যে-সং সেই-সং হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর ছোট-আদালতের ঘর। বার কারিগরের বড় প্রশংসা

করিতে পারি না। কেন না, গৃহ-মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই আমরা কে হাকিম, কে উকীল, কে মোক্তার, কে বাদী, কে প্রতিবাদী,—তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কেবল সকল পুত্তলিই চালচিত্রের মত ঠাসাবুনানি মনে হইল। কিন্তু আমরা সম্পাদক, সুতরাং ক্রমে ক্রমে সকলই বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম যে, যে তিনজন বসিয়া আছেন, তাহার মধ্যে একজন হাকিম, দুইজন মোহরর। হাকিম কিসে বুঝিলাম—তিনি কেদারায় বসিয়া আছেন বলিয়া; মোহরর কিসে বুঝিলাম—তাহারা বেঞ্চে বসিয়া আছে বলিয়া,—নহিলে চেহারায় বড় কিছু বুঝা যায় না। আর চাপকানের বোতাম তিনজনের মধ্যে কাহারও যে সবগুলি ছিল, তাহাও আমি আজ বৎসরের শেষ দিনে হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি। সুতরাং আকারে প্রকারে তিনজনে একই রূপ। আর যদি সদর বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অন্দরের কথা অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তিনজনের বিদ্যা-সাধ্যও যে বড় উচ্চ-নীচ হইবে, এমন ত বোধ হয় না। সুতরাং ছোট-আদালত-সং-নির্ম্মাতা কারিগরের বড় প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যাহা হউক গৃহ-মধ্যে এই তিন অবতারমাত্র উপবিষ্ট; [illegible]ড়া অবতারের জঙ্গল আছে। কতকগুলি হস্তপ্রসারণ করিয়া মুখ-ব্যাদান করিয়া আছেন,—ইঁহারা উকীল; কতকগুলি তাঁহাদিগের পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে সেইরূপ মুখ-ব্যাদান করিয়া আছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু মিষ্ট হাসি আছে,—ইঁহারা মোক্তার। যাঁহারা মুখ গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা প্রতিবাদী; আর যাঁহারা কাঁদ কাঁদ ভাবে আছেন, তাঁহারা বাদী।

এইরূপ ছোট-আদালতের মূর্ত্তি সকল একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; নহিলে সংএর হিসাবে ধরিতে গেলে নিতান্ত মন্দ নয়।

আমরা স্থানাভাব-প্রযুক্ত এজ্‌লাশ-সং শেষ করিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতীত 'সেই একদিন, আর এই একদিন' নামে একটি বৃহৎ সং আছে। 'রায়বাহাদুরে রায়বাহাদুরে সাক্ষাৎ', 'মিউনিসিপ্যাল মিটিং' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সং আছে। এমন গ্রীষ্মের সময় আমাদিগের গরমাগরম চনকচূর্ণে গ্রাহক-পাঠকের বিরক্তি না দেখিলে বারান্তরে প্রকাশ করিব।

৩১ চৈত্র, ১২৮০] [সাধারণী—১ ভাগ, ২৫ সংখ্যা

২৩

উপন্যাস

মুদ্রাযন্ত্র বড় কল্যাণকর। মুদ্রাযন্ত্রে সহস্র সহস্র শয়তানকে দশটা-পাঁচটার গোলামিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নহিলে এই সকল শয়তান হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়িত,—দেশে মহা বিভ্রাট ঘটিত। মুদ্রাযন্ত্রে যাহা কিছু পাঠাইয়া দিবে, শয়তানিতে ঐ সকল তখনই ধাতুময় হইবে, প্রুফ-পণ্ডিত তখনই তাহা শোধিত করিবে, পীরবক্স তখনই শাদার উপর কালি পাড়িতে থাকিবে, তাহার পর উপহার-পুস্তকের অবলম্বনে হউক, মাসিক পত্রের প্রবন্ধে হউক বা সংবাদ-পত্রের প্রেরিত স্তম্ভে হউক, সেই যাহা কিছু—দিব্য 'হ্রস্ব-দীর্ঘ'র নিশান উড়াইয়া, 'রফলা-হ্রস্ব'র লাঙ্গুল ছড়াইয়া, রেফের সঙ্গীন বাঁকাইয়া ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অনন্ত সাগরে, উজ্জ্বল-ক[illegible]ল বেশে বিরাজ করিবে। মুদ্রাযন্ত্রের মত কল্যাণকর আর কিছু আছে কি? মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে যাহা কিছু সমস্তই—

সমানি সম-শীর্ষাণি

ঘনানি বিরলানি চ।

—সুতরাং সুলিখিত। এমন সুবিধা-সুযোগের সময়ে যে হতভাগারা সুলেখক—অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের উপাসক হইল না, তাহাদের গর্ভধারিণীরা বন্ধ্যা হইল না কেন? কেন—তাহা জানি না,—তবে এই মাত্র জানি তাহারা বন্ধ্যা নহে এ[illegible] বাঙ্গালার অবন্ধ্যা-পুত্রগণ নির্ব্বোধ নহেন,

সুবিধা-সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। শয়ন-গৃহে অন্ধকারে চোর প্রবেশ করিলে, তখন খট্টাতলে নিঃশব্দে বিরাজ করাই সুবিধা—বাঙ্গালি তাহা করেন না কি? আর সুদূরে রুষ-ঋক্ষ হুঙ্কার করিলে, তখন দেশ-ভক্তি, রাজ-ভক্তি দেখাইবার জন্য—সখের সৈনিক হইবার জন্য দরখাস্ত করাই সুবিধা—বাঙ্গালি এরূপ সুযোগ কখন ছাড়িয়াছেন কি? অতএব মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সুলেখক হইবার সুযোগও বাঙ্গালি ছাড়েন নাই—বাঙ্গালি সকলেই সুলেখক।

কিন্তু লিখিবার যন্ত্র আছে, পড়িবার যন্ত্র কৈ? হতভাগা ইংরাজ! এক্‌জিবিশন্ খুলিবি ত আগে হাতে পয়সা গতাইয়া দিলি না কেন?—শুধু কি জিনিষ-পত্র দেখিয়াই তৃপ্তি হইবে? লেখাপড়া শিখাইবি ত ভাল চাকরি দিবি না কেন?—লেখাপড়া কি ধুইয়া খাইব? চাকরি দিবি ত মোটা মাহিনা দিবি না কেন?—পুরুষানুক্রমেই কি চাকরি করিব? মদের আমদানিই যদি করিবি, তবে আর টেক্স নিবি কেন?—স্যাম্পেন কি কেবল তোরাই খাবি, আমরা কি দেশের কেহ নই? ছাপিবার যন্ত্র করিলি ত পড়িবার যন্ত্র করিলি না কেন?—হতভাগারা তোমাদের সকল কাজই আধাআধি!

বক-চরণ-বিক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে প্রবিষ্ট গ্রন্থকার। তাঁহার অঙ্গরক্ষ-কক্ষ-মধ্য হইতে নবমুদ্রিত পুস্তকের বড় বড় দুই একটি নামাক্ষর, নবোঢ়া বধূর ত্র্যঙ্গুলি-বিদীর্ণ অবগুণ্ঠনের মধ্যস্থ চক্ষুর মত উঁকি মারিতেছে। "আসুন, বসুন, ভাল হয়ে বসুন। আপনার পিরানের পকেটে ওখানি কি?"—"আজ্ঞে, একখানি নূতন পুস্তক—নাম "বিষম সমস্যা," আপনাকে উপহার দিতে আসিয়াছি।" হস্তে প্রদান। গ্রহিতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে সেখানে দেখিয়া—"এ সকল সমস্যার অনেকগুলির উত্তর

'পুষ্পাঞ্জলি'তে আছে।"—"আজ্ঞে, কুসুমাঞ্জলি ন্যায়শাস্ত্র, তত বিদ্যা আমার নাই।" "আমি ভূদেববাবুর পুষ্পাঞ্জলির কথা বলিতেছি।" "আজ্ঞে, তাহাও পড়ি নাই।" তখন বাবুকে শিষ্টাচারে মিষ্টালাপে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এদেশে ছাপিবার কল আছে, অথচ পড়িবার কল নাই; তাহাতেই এই বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের দেশের জ্বর, দেহের জরা, নদীর চড়া, নদের ভাঙ্গন, চিনির গবাস্থিকতা, ঘিয়ের ভেজালতা, যুবকের বাচালতা, যুবতীর চপলতা—এ সকলের জন্য ইংরাজ যখন দায়ী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখন এই লিখিবার যন্ত্র থাকা—অথচ পড়িবার যন্ত্র না থাকার জন্য ইংরাজ যে দোষী, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? ইংরাজ দোষী—সুতরাং আমরা খালাস; কাজে কাজেই আমরা নির্দোষ, অতএব নিশ্চিন্ত।

যন্ত্র আছে বলিয়াই আমরা সকলেই সুলেখক—যন্ত্র নাই বলিয়া আমরা সকলেই অপাঠক। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাউক যে, বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিত হয়, পঠিত হয় না—

বিলক্ষণ! সে কথা কে বলিবে? গোড়াতেই অশুদ্ধ হইয়াছে—তাইতে মীমাংসাতেও গোল পড়িতেছে। ইংরাজ আমাদের উপর যতই কেন দ্রোহিতাচরণ করুন না, ভগবান্ ত আছেন। ইংরাজ এই যে, ভাত রাঁধিবার, মাড় গালিবার, জ্বরে ভুগিবার, মড়া পোড়াইবার কল আনেন নাই, তা বলিয়া কি আমরা ভাত খাই না, না জ্বরে ভুগিনা, না মরিলে পুড়ি না—সকলই ত আমরা করি। তোমরা ইংরাজের গোঁড়া, তাই ইংরাজের কলের গৌরব কর, আবার ইংরাজকেই গালি-পাড়'। ইংরাজ বিরূপ্ হইলই বা,—ভগবান্ ত স্বরূপে সপ্রকাশ আছেন।

রূপক ও রহস্য

ভগবানের যে অপার করুণাবলে বাঙ্গালি সন্তানের জন্মদাতা হইয়া নিশ্চিন্ত,—পালনের ভার গৃহিণীর উপর,—সেই করুণাবলেই বাঙ্গালি লিখিয়া নিশ্চিন্ত, পাঠ করিবার ভার সেই গৃহিণীদের উপরেই আছে। বলিহারী সামঞ্জস্যসাধন! আর বলিহারী শ্রমবিভাগ! এমন নৈলে কি সংসার চলিত গা! সকল বিষয়েই যেমন হউক একটা ভাগ-বাটোয়ারা চাই। এই আমরা টেক্স দিই, ইংরাজ বৃত্তিভোগ করেন; আমরা দক্ষিণা দিই, পুরোহিত-ঠাকুর ধর্ম্মকর্ম্ম করেন,—সেইরূপ আমরা লিখি, তাঁহারা পাঠ করেন।

অতএব বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিতও হয়, পঠিতও হয়; তবে—

যারা লেখে, তারা পড়ে না,
যারা পড়ে, তারা লেখে না।

লেখক-পাঠকের এইরূপ অদ্ভুত বিড়ম্বনা অভূতপূর্ব্বরূপে সমঞ্জসীভূত হওয়াতে বাঙ্গালায় প্রতিনিয়তই একরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে,—সেগুলির নাম উপন্যাস। উপসর্গে একটু রঙ্গদারি আছেই আছে; উপন্যাস অর্থে রঙ্গদারি কেতাব—সাধু ভাষায় রঞ্জনকর পুস্তক।

প্রকৃতি-রঞ্জনেই রাজার রাজত্ব, পুরুষের পুরুষার্থ। সেই প্রকৃতি-পুঞ্জই যখন আমাদের লেখনের লক্ষ্য, তখন রঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ। অতএব বঙ্গভাষায় মনোরঞ্জক গ্রন্থের বা উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব।

রঞ্জন-নীতি ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কিছুই কি নাই? আছে বৈকি—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি—সকলই আছে। কিন্তু সকলই ঐ মূল নীতি—রঞ্জন-নীতিতে ওতপ্রোত। বাঙ্গালায় ধর্ম্মনীতির অমৃত, রাজনীতির গরল, গার্হস্থ্য-নীতির মধু এবং শিক্ষা-নীতির নিম্ব—সকলই

সমভাবে উপন্যাসে উপন্যস্ত হইতেছে। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকাগ্রগণ্য স্বীয় স্বীকারোক্তি কলমবন্দী করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য যাহা কিছু প্রায়ই উপন্যাসে প্রকাশিত করেন, আর মুদ্রাবিভ্রাটগ্রস্ত মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারিগণও অনবরত উপন্যাস বিন্যাস করিয়া প্রমাণীকৃত করিতেছেন যে, বাঙ্গালায় উপন্যাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। (এই স্থলে পাঠকগণকে—প্রবিন্দু! আপনার কথা আপনিই ভুলিতেছিলাম,—পাঠিকাগণকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন বঙ্গে নাটক নামে প্রচারিত গ্রন্থগুলিকেও উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করেন, কেন না সেগুলিতে কেবল উপন্যস্ত বিবরণ আছে,—নাটকত্ব কিছুই নাই।)

দুই আর দুইএ চারি, যদি এই গণিততত্ত্ব দেশে বুঝাইতে হয়—'তোমার দেশকে তুমি ভাল বাসিও'—এ কথা যে দেশে দিবারাত্র শিখাইতে পড়াইতে হইতেছে, সে দেশে যে গণিতের ঐ গভীর তত্ত্ব অচিরকাল-মধ্যে বুঝাইতে হইবে,—এমন ভরসা আমাদের সম্পূর্ণই আছে। —যদি তেমনই সুদিন, আর তেমনই সুযোগই হয়—যদি দুই আর দুইএ চারি—এই কথা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে লিখিতে হইবে,—

"সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বিজয়পুরের বিজন গঙ্গাতীরের কুল কুল ধ্বনিতে তটস্থ ঝিল্লী-রবের সুর সম্মিলন হইতেছে। অষ্ট-বর্ষ-বয়স্ক বিপিন চারি বৎসরের ললিতার গলা জড়াইয়া বেড়াইতেছে। ধূসরাকাশে একটি তারা টীপের মত দেখা গেল। বিপিন বলিল,—'ললিতে! তোমার আমার কয় চক্ষু?' ললিতা বিপিনদাদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কে হাসিল, বলিল,—'জানি না।' তখন বিপিন ললিতার হস্ত লইয়া একে একে আপনার চক্ষুদুটি ও ললিতার চক্ষুদুটি স্পর্শ করিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল,—'এক, দুই, তিন, চারি,'—তাহার পর

জিজ্ঞাসা করিল,—'এখন বল, তোমায় আমার কয় চক্ষু?' ললিতা হাসিয়া বলিল,—'চারি চক্ষু।' বিপিন বলিল,—'দেখ, ভুলিও না—দুই আর দুইএ চারি হয়।' তখন আবার সেই চারি চক্ষু মিলিত হইল। মরি! মরি! বালপ্রণয়ের কি মাধুরী! ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

ললিতা-বিপিনের উপন্যাস উভয়ের বিবাহে, অর্থাৎ চারি চক্ষুর শুভ সম্মিলনে সমাপ্ত। এরূপ মনোহর উপন্যাস পাঠের পর দুই আর দুইএ যে চারি হয়, তাহা তোমরা কি আর কখন ভুলিতে পারিবে? যদি তোমরা তবু ভুলিয়া যাও, তবে কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইবে, তোমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। যদি উপন্যাস পাঠ করিয়াও ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি তোমরা না শিখিতে পার, তবে তোমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

আমরা—অর্থাৎ ছোট, বড়, মাঝারি গ্রন্থকারেরা এবং ছোট, বড়, মাঝারি সমালোচকেরা দুঃখিত অর্থাৎ বিড়ম্বিত। যদি পাঠকের প্রবৃত্তি-দোষে উদ্দেশ্য উপলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে গ্রন্থকার মহা বিড়ম্বিত হন।

বঙ্গের সাধারণ পাঠকের কেবল বালস্ত্রীসুলভ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার এবং মজা দেখিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকাতেই তাঁহারা নারীজাতির অন্তর্গত এবং পাঠকের ঐরূপ অগভীর প্রবৃত্তি হওয়াতেই সকল শ্রেণীর গ্রন্থকার অগত্যা তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ ব্যগ্র। ফল এই হইতেছে—পুস্তকপাঠে পাঠকের ক্ষণিক রঞ্জন হইলেই,—পাঠক একটু মজা পাইলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সকল সদ্গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষা। লোকে কিন্তু রঞ্জন অরঞ্জনই

বুঝে; রঞ্জন হইলেই চরিতার্থ হয়। সুতরাং বাঙ্গালার অধিকাংশ সদ্‌গ্রন্থই অধিকাংশ স্থলে বিড়ম্বিত।

ও দিকে আবার অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থমাত্রের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাজে উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত হন,—পালা ভুলিয়া গিয়া সঙের পর সঙ্‌ দিয়া যাত্রা শেষ করেন। পূর্ব্বে প্রতি পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন হইত, দুধদ'য়ে মুখ দিবে বলিয়া সকাল হইতে বিড়াল বাঁধা হইত। এখন ব্রাহ্মণভোজন আর হয় না, দুধদ'য়ের সম্পর্ক নাই,—কিন্তু পূর্ণিমায় বিড়াল বেচারা বাঁধা পড়ে। অনেক গ্রন্থেরও ঠিক এই দশা—দুধদ'য়ের সম্পর্ক নাই, কিন্তু বিড়াল বাঁধা আছে; সারাদিন তার মেওমেওয়ানি—গন্ধ ত কেবল গন্ধ—হাঁফ ছাড়িতে পাওয়া যায় না।

আষাঢ়, ১২৯৫] [নবজীবন—৪র্থ ভাগ

২৪

মতিচূরের সঙ্গে সঙ্গে

চেনাচূর

বঙ্গদর্শন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই নারী-গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হন। এক মাস না যাইতেই রামচন্দ্রের সীতানির্ব্বাসন উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীকে কেহই সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে না।

"যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন-সুখের প্রথমশিক্ষা-দাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে?"*

কিছুদিন পরে বঙ্গদর্শন আবার নগেন্দ্র দত্তের মুখ দিয়া সূর্য্যমুখীর প্রশংসা নির্গত করিয়া নারী-গুণবর্ণনা করিলেন। নগেন্দ্র বলিতেছেন,—

* "উত্তর চরিত"—বঙ্গদর্শন, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

"সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ। আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতে আশা, পরলোকে পুণ্য!"

দ্বিতীয় বৎসরে বঙ্গদর্শন আর সে প্রকার মর্ম্ম-পরিচায়ক বাক্যে নারী-গুণ-বর্ণন করেন নাই। পূর্ব্ব বৎসর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, প্রীতি দেখাইয়াছিলেন, ভক্তি দেখাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় বৎসরে একবার আদায়নীর আদর করিলেন,—বলিলেন,—

"ত্রিভুবন-মাঝে যেন একই কুসুম পূর্ণিত সুবাসে,
বরষার রাতে যেন একই নক্ষত্র আঁধার আকাশে।
নিদাঘ-সন্তাপে যেন একই সরসী বিশাল প্রান্তরে,
রতন-শোভিত যেন একই তরণী অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি প্রিয়ে, সংসার ভিতরে॥

চির-দরিদ্রের যেন একই রতন—অমূল্য অতুল,
চির-বিরহীর যেন দিনেক মিলন—বিধি-অনুকূল।

চির-বিদেশীর যেন একই বান্ধব—স্বদেশ হইতে,
চির-বিধবার যেন একই স্বপন—পতির পিরীতে।
তেমনি আমার তুমি প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥

সুশীতল ছায়া তুমি নিদাঘ-সন্তাপে রম্য বৃক্ষতলে,
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র—বরষার জলে,
বসন্তের ফুল তুমি—তিরপিত আঁখি রূপের প্রকাশে,
শরতের চাঁদ তুমি চাঁদবদনি লো!—আমার আকাশে।
কৌমুদী মধুর হাসি দুখের তিমির নাশে॥

অঙ্গের চন্দন তুমি পাখার ব্যজন কুসুমের বাস,
নয়নের তারা তুমি শ্রবণের শ্রুতি দেহের নিঃশ্বাস।
মনের আনন্দ তুমি নিদ্রার স্বপন জাগ্রতে বাসনা,
সংসারে সহায় তুমি সংসার-বন্ধন বিপদে সান্ত্বনা।
তোমার লাগিয়া সই ঘোর সংসার-যাতনা॥"*

এ বৎসর † বঙ্গদর্শন আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন বা অধিকতর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, বলিতে পারি না,—কিন্তু এ বৎসর সম্পূর্ণ ভাবান্তর। প্রথমেই বৈশাখে 'নর-বানর,' সুতরাং "প্রাচীশা এবং নবীনা"

* "আদর।"

† তৃতীয় বর্ষ।

লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল; ভ্রমর ভায়া * অমনি সেই সুরে সুর ধরিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কমলাকান্ত † প্রসন্ন গোয়ালিনীর মান গাছের পাশ হইতে তাহার মুক্তাবগুণ্ঠন মুখমণ্ডল দেখিয়া আসিয়া আফিঙ্গের মাত্রা চড়াইয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোকের রূপ নাই,—পৃথিবীতে যে কিছু রূপ আছে

---

* কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন-যন্ত্র হইতে 'ভ্রমর' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকিত না, তবে সকলেই জানিতেন বঙ্কিমবাবু ইহার সম্পাদক।

"যেখানে দেখিবে বঙ্গশোভা কামিনীকুসুম অধরে মধু, নয়নে বিষ লইয়া ফুটিয়া আছেন, সেইখানে গিয়া গুণ গুণ করিয়া তাঁহাদের গুণ বলিয়া আইস।"

প্রবন্ধ—"ভ্রমর"।

"হে দেবি! এ বঙ্গভূমে তুমিই একা জাগ্রৎ; অতএব তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বব্যাপিনী! কেন না সকল ঘরে আছ। তুমি অন্নপূর্ণা! কেন না তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক। তুমি অভয়া! কেন না তুমি পতির বাবাকেও ভয় কর না। তুমি দিগম্বরী! যে অবধি শান্তিপুরে ধুতি উঠিয়াছে। তুমি রক্ষাকালী! কেন না পতির পরমায়ু তুমি বাম করে রক্ষা করিতেছ। তুমি মহামায়া! কেন না জ্ঞানী কি অ-জ্ঞানী তুমি সকলকে ভুলাইয়াছ। তুমিই পুরুষের চক্ষুঃ, তুমিই কর্ণ, তুমিই জ্ঞান; তাহারা আপন চক্ষে যাহা দেখে তাহা মিথ্যা; আপন কর্ণে যাহা শুনে তাহা [illegible]। এ সংসারে তুমিই কর্ণধার! কেন না তুমি সকলের কর্ণ ধরিয়া চালাইতেছ। তোমার নিমিত্ত সকলে মোট বহিতেছে; তোমারই নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষার ঝুলি বহিয়াছেন। হে দেবি! তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, তোমার বীজমন্ত্র ওঁকার না অলঙ্কার? হে সুরুচি! তুমি স্বরূপ বল, মৎস্যের "লেজা" ভালবাস, কি প্রতিবাসীর "মুড়া" ভালবাস! হে দেবি! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ড ঘুরাইতে পার—কথায়; পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে; পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।"

প্রবন্ধ—"স্ত্রীজাতি-বন্দনা।"

ভ্রমর—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ, ১২৮১।

† কমলাকান্তের দপ্তর—"স্ত্রীলোকের রূপ।"

তাহা আব্‌কারী মহলে। আষাঢ়ে চণ্ডিকা, * খণ্ডিকা, পণ্ডিতা, খণ্ডিতা আর রসময়ী মণ্ডিকার নাম করিয়া নারীদিগের উপর কত কথাই হইল। শেষে শ্রাবণে স্থির করিলেন যে, বঙ্গসঙ্গিনী পাগলিনী না হইলে বাঙ্গালির সুখ নাই। বলিলেন,—

"ওই কান্না ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শূন্য-হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার!"†

—"বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু"—সেই ক্রমে হইল কিনা—"পাগলিনি রে আমার!"

তাহার পর বঙ্গদর্শন ভাদ্র মাসটা কোন প্রকারে কাটাইয়া এই আশ্বিনে বড় অত্যাচার করিয়াছেন। যে কমলাকান্তের উদ্ধ-সাত-পুরুষের বিবাহ হয় নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতেছেন,—

"পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ; খরিদ্দারের জন্য লেজ আছ্‌ড়াইয়া ধড় ফড় করিতে থাকে; যত বেলা হয়, তত কল্‌সা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া বিক্রয়ের জন্য খাবি খায়।" ‡

ভাল, কামলাকান্ত আফিঙ্গখোর, পচা ঘোল বিক্রয় করে—তাহার কথা না ধরিলেও চলে, কিন্তু উপন্যাসে দেখিলাম, লেখক লবঙ্গলতার গুণবর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

"ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি,

* "তিন রকম।" নং ১—শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী।
† "পাগলিনী।"
‡ কমলাকান্তের দপ্তর—"বড় বাজার।"

ষোল-আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।" *

এই গেল **বঙ্গদর্শনের মতিচুর** ; তাহার পর ধরুন **সাধারণীর চেনাচুর।**

রামসদয় আবার ললিত-লবঙ্গলতার পক্ষে কেমন ?—তিনি তাঁহার সিন্দুকের সোনার বাউটি, বিছানার পাশবালিশ, পানের লবঙ্গ, গেলাসের সরবৎ। তিনি কম্পজ্বরে পৃষ্ঠচাপ, জলকাসিতে চুপ্‌চাপ, বাতে সুবন্ধন, আরোগ্যে সুরন্ধন।

তিনি জগা চুনারীর ঢোল, বাঙ্গারামের খোল; তিনি নবদ্বীপের টোল, আর বিষ্ণুয়ের দোল। তিনি রোহিতের ঝোল, আর দরিদ্রের কোল—বড় মিষ্ট।

তিনি বিষয়-কর্ম্মে দৃষ্টি, ভজন-সাধনে ইষ্টি; তিনি গুরুদেবের তুষ্টি আর পুরোহিতের পুষ্টি; অন্ধের যেমন যষ্টি, বন্ধ্যার যেমন ষষ্ঠী, আর সৃষ্টিছাড়া চুয়াত্তর সালের যেমন বৃষ্টি—বড় প্রয়োজন।

বাবুর পক্ষে যেমন ব্রাণ্ডী, পাগলের বীরখণ্ডী, পাড়াগেঁয়ের রুসমুণ্ডী—রামসদয় সেইরূপ। তিনি মটনে মষ্টার্ড, সূপে জিঞ্জর। হোটেলের চাপরাসী, আদালতের আমলা।

তিনি ছাপাখানার সংবাদ-পত্র, সংবাদ-পত্রের সমালোচন, সমালোচনের রসিকতা, সেই রসিকতার মূর্খতা, সেই মূর্খতার উপসংহার, উপসংহারের আশীর্ব্বাদ। ফল কথা রামসদয় সাধারণীর চেনাচুর।

১২ আশ্বিন, ১২৮১] [সাধারণী—২ ভাগ, ২৪ সংখ্যা

* "রজনী"—২য় পরিচ্ছেদ।

২৫

নব বাণিজ্য

এ নব বাণিজ্যে, ভাই! জীবন খোয়াই।
হিসাব করিয়া দেখি কি দিয়া কি পাই॥
আরে কি দিয়া কি পাই! ধ্রু

কাঞ্চন বদলে কাচ পাইনু,
পৈঁছার বদলে চুড়ী,
মুকুতা বদলে শুক্তি পেলাম,
হীরার বদলে নুড়ী।

পট্টবাস বদলে পাটের ছাল্‌টি,
রুমাল বদলে রেপার,
কাশ্মীরী বদলে কাশ্মীর * মিলেছে,
ঘুন্‌সির বদলে কার্‌।

কাঁচাদুধ বদলে চা-দুধ চলেছে,
মিষ্টান্ন বদলে কেক্‌,
চাপাটি বদলে পাঁওরুটি বাসি,
বাটুলা বদলে ডেক্‌।

---

* Cassimere.

নব বাণিজ্য

মৃগের বদলে মুর্গি চলেছে,
দধির বদলে চাট্‌নি,
পলান্ন বদলে পলাণ্ডু-খিভাত,
গল্পের অভাবে খুট্‌নি।

দয়া-ধর্ম্ম বদলে দেহ-ধর্ম্ম বুঝেছি,
দান দিয়া নাম করা,
সৌজন্য বদলে সামান্যে ঘৃণা,
গৌরাঙ্গের পা ধরা।

সাহস বদলে সাপট পাইনু,
হর্ষের বদলে হাসি,
কর্তৃত্ব বদলে বক্তৃত্ব পেয়েছি,
লঘু-কাজী, বহুভাষী।

পাণ্ডিত্য বদলে ভাণ্ডিত্য পেয়েছি,
শিক্ষার বদলে শিখা,
বেদাঙ্গ বদলে বিড়ম্বনা আছে,
মূলের বদলে টীকা।

গাম্ভীর্য্য বদলে দাম্ভিক্য পেয়েছি,
জ্ঞান বদলে গর্ব্ব,
সারল্য বদলে তারল্য মিলেছে,
দীর্ঘের বদলে খর্ব্ব।

আগম তন্ত্র দিয়া অগস্তকোমৎ * পানু,
কিন্তু তাও নাম মাত্র,
বিদ্যার বদলে বিবাদ হতেছে,—
সমান শিক্ষক-ছাত্র।

যজন বদলে যাজন হতেছে,
দক্ষিণা বদলে ভিক্ষা,
ইষ্টগুরু বদলে ইষ্টুপিট জুটেছে,
উপদেশ বদলে দীক্ষা।

স্বাস্থ্যের বদলে রাস্তা পেয়েছি,
জোরের বদলে জ্বর,
তস্কর বদলে টেস্কর দারোগা—
সঙ্গে আসেসর।

বিষয় বদলে বিচার মিলেছে,
বৈভব বদলে টাইটেল্,
মান বদলে নাম গেজেটে,—
কিম্বা মামলা লাইবেল্।

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক অগস্‌ৎ কোন্‌ৎ (Auguste Comte)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ইংরাজী-শিক্ষিত মনস্বিগণ কোমৎ-দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

গৃহস্থালী বদলে পাকস্থলী বুঝেছি,—
স্বজন-পরিজন ভুলি,
ভিক্ষা না দিয়া শিক্ষা দিয়া থাকি,—
'খেটে খাও', 'দূর হও' বুলি।

গৃহিণী বদলে গহনা-ভিখারিণী,
ভায়ের বদলে শালা,
কুটুম্ব বদলে কুপোষ্য জুটে—
ব্যাভারে ঝালাপালা।

সঙ্গীত বদলে সঙ্গত আছে,
তান-লয় বদলে তাল,
আমোদ বদলে মদেরি বোতল,—
জ্ঞান খোয়ায়ে গাল।

নমস্কার বদলে আবিষ্কার হয়েছে—
মাথা নাড়া নাড়ি!
আলিঙ্গন বদলে হস্ত-কম্পন,—
পঞ্জা লড়া লড়ি।

ক্ষমতা বদলে সমতা হয়েছে,—
সমান মিছরি-মুড়ি,
রক্ষক বদলে ভক্ষক জুটেছে,
(দেয়) পনের বদলে বুড়ি।

পঞ্চায়ৎ বদলে লাঞ্ছনা হ'য়েছে,—
জজের গোলাম জুরি,
শাসন বদলে শোষণ চলেছে—
দেহি দেহি ভূরি।

রাজত্ব বদলে বাণিজ্য হ'তেছে,
কোটীর বদলে লক্ষ,
অবুত বদলে নিযুত লইয়া
ভাণ্ডার ভরিছে যক্ষ।

সর্ব্বস্ব বদলে সভ্যতা পেয়েছি,—
চক্ষু থাকিতে অন্ধ!
কঙ্কণ * বদলে অক্ষয় গাইছে—
কাব্যের বদলে ছন্দ॥

১৪ মাঘ, ১২৯০] [সাধারণী—২১ ভাগ, ১১ সংখ্যা

---

* শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলে বাণিজ্যের বিষয় কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে বিস্তারিত লিখিত আছে। বাণিজ্য-বিনিময় প্রসঙ্গে লিখিত—

"কুরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে, নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে অটঙ্গ দিবে, শুঁঠের বদলে টঙ্ক॥" ইত্যাদি

কবিতার অনুসরণে 'নব বাণিজ্য' লিখিত হইয়াছিল।

২৬

চনকচূর্ণ

(সংবাদ-পত্র)

ঝমাঝম বাদল হবে, গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতে থাকিবে, বুকের ভিতর দুড়্ দুড়্ করিবে, তবে ত চনকচূর্ণের আদর হবে। পোড়া আকাশে জল নাই, খালে বিলে জল নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই, কলসীতে জল নাই, কেবল অভাগা বাঙ্গালির চোখের জলে বাদল করিয়া কি চেনাচুর খাইবে? দেবতার জ্বালায় এ চনকচূর্ণের ব্যবসা উঠাইয়া দিতে হইল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—দুই মাস ত ওলাবিবির ভয়ে চনকচূর্ণের নামটি পর্য্যন্ত করি নাই; আষাঢ় মাসও যায়—আজ আকাশটা একটু স্থর্য্যিটেরা গোছ হয়েছে, একবার ডেকে দেখা যা'ক কি হয়।

চা-আই চেনাচুর গরমা গরম, ধরম-অধরম, সরম-অসরম। পৈলা নম্বর—কিষণ দা-আস কি চেনা *—জোর মসালাদার—বড়া আদ্‌মি লেতেহেঁ—বড়া আদ্‌মি খাতেহেঁ—বড়া আদ্‌মি এস্কা ভেদ জান্‌তেহেঁ। বাঙ্গালা জমীন্দার লোক ইসিকা কিম্মৎ জান্‌তেহেঁ। চা-আই কিষণ দা-আস কি চেনা—তেরা রূপেয়া চার্ আনা—বরষ্‌ভর খাও, পূরা হরষ লেও। চল্‌আও খরিদার, আও।

---

* হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন।

দুস্‌রা নম্বর—বাগ্‌বাজারকি * চেনাচুর—বড়া রঙ্গদার, মিঠা মসালা, গরম্ তশালা। অমৃৎ-বাজারমে ইস্ চেনাচুর সৃষ্টি হুয়া, বহুবাজারমে স্থিত হুয়া, আবি খাস্‌মহল বাগ্‌বাজারমে ইয়ে মহাপ্রলয় করেগা! প্রলয় দেখোগে ত আও খরিদার, চল্‌আও। ইস্‌মে পলিটিক্স ভাজা হোতা হ্যায়, দিল তাজা হোতা হ্যায়, বাঙ্গালি রাজা হোতা হ্যায়, ইণ্ডেয়ারি বহুৎ মজা হোতা হ্যায়। মিঠাকড়া মসালা, নরম গরম তশালা—আও চল্‌আও।

তিস্‌রা নম্বর—সেন্‌জীকি চেনা †—ধরমসে খানা। সেনজীকি চেনা গরমা গরম এক এক আনা। ধরম্ শিখোগে, করম্ শিখোগে, সরমাকি চেনা, বড়া কারখানা। এক মুট্‌ঠি খা লেও, পরকাল ভালা হোগে, পরিত্রাণ মিলেগা, ভব-বন্ধন সব খুল জাগা। সাহেব, বাঙ্গালি—ভূত আর দেও—চন্দন আর ভস্ম সব ভি এক হোজাগা। ধরমকি গরম চেনা—করমকি নরম হোনা—সব ছোড়্‌কে আপ্‌নে বাঁচানা।—এহি ধরম্, এহি করম্। আও খরিদার-লোগ—চল্‌আও—আও।

সু-উ-উলভ ‡ চেনা—সব কোই লেনা।
নগদ খরিদার, সব্‌সে মজাদার।
গ্রাহককা নাম জুঠানা,
বড়া পর-ইন্তাজার।
কোম্পানিকা কল্‌কা পয়সা এক,
খরিদার-লোক ঘুম্‌কে দেখ্।

---

* 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'।

† ইণ্ডিয়ান মিরর-পত্রিকা-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

‡ 'সুলভ সমাচার'।

মাঝি-মাল্লা, কাজী-মোল্লা,

বেপারী উতারো দাঁড়ী-পাল্লা;

খলক খোদাকা, মুলুক মহারাণীকা,

নগদ এক এক পয়সা দেও,

খাসা আখ্‌বর সু-উ-লভ লেও।

সু-উ-উলভ চেনা—সব্‌কোই লেনা।

ভট্টাচার্য্যকি চেনা * সোমবারকো লেনা। এস্মে প্রা-আ-আড়্-বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ † হ্যায়, সহা-আ-আনুভূতি হ্যায়, উদুখল হ্যায়, বৃষ্টত্রাম হ্যায়। ইয় সব্ মিল্ কর্ ভট্টাচার্য্যকি চেনা বনায়া হুয়া হ্যায়। ইস্মে ইষ্ট, নিষ্ঠ, শিষ্ট, কৃষ্ণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, সংবাদ, বিসংবাদ, বাদানুবাদ, অপবাদ—সব ভাজা ভাজা, তাজা বতাজা মিলেগা। ভট্টাচার্য্যকি চেনা সোমবারকো লেনা।

বিলাতী চেনা-আ-আ। ইয়ংবেঙ্গল চল্‌আও।

ডেইলি নিউস্ আখ্‌বর,

ইংলিশম্যান্ জবর;

ফ্রেণ্ডইণ্ডিয়া ‡ খোস্‌বর,

আর নওয়া অব্‌জরবর।§

---

* 'সোমপ্রকাশ'

† মলিম্লুচ অর্থে চোর। প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) ও মলিম্লুচ শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণে উদাহরণ-স্বরূপ একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সোমপ্রকাশে উৎকট সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহৃত হইত।

‡ পাদ্রি মার্সম্যান-সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (Friend of India) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে রবার্ট নাইট ইহার স্বত্ব ক্রয় করায় ষ্টেটস্‌ম্যানের সহিত ইহা মিলিয়া গিয়াছে।

§ ওরিয়্যাণ্টাল অব্‌জার্‌ভার (Oriental Observer) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা।

যো দিল চাহে—চীজ নফীজ।
কিটীংস্ কফ লজেঞ্জেস্,
থ্রো ইন্টু দি গ্যাঞ্জেস্।
সুইট ইডিনবর বিস্কীটস্
থ্রো ওবর দি ষ্ট্রীটস্।
বিলাতী চেনা—ইয়ংবেঙ্গল লেনা।
ভালা আখ্‌বর, লিখা ভি জবর,
বিলাতী চেনা, গরম গরম লেনা,
চাকা সাত পিনা, টেবিলমে রাখ্‌না,—
আও—আও—

সব্‌সে পিছে সাধারণীকা চেনা, আওর কেয়া বোল্‌না।

আত্ম-গুণ-গরিমা হোতা হ্যায়, নতুবা হরিএক গুণ বালায়কর উচ্চৈঃরবে চীৎকার কর্‌না।

চাই চেনাচুর গর্‌মাগরম, ধরম্ অধরম্, সরম অসরম্—

আরে মলো—চাঁপ্‌দানির মাঠের মাঝখানে চেনাচুর ডাক্‌ছি নাকি? শেয়ালে কি চেনাচুর নেবে? সবগুলো ডেকে উঠলো দেখ্‌ছি।

২২ আষাঢ়, ১২৮১] [সাধারণী—২ ভাগ, ১২ সংখ্যা

২৭

ক্রোটনের কথা

আমি ক্রোটন ভালবাসি না। বাবুভায়াদের বড় বড় বৈঠকখানার উঠিবার সিঁড়ির দুই ধারে, বাগানের যেখানে সেখানে—এখানে ওখানে যে পাঁচরঙ্গা-পাতার বিলাতী রঙ্গিন গাছগুলা দেখা যায়—সেই গুলাই ক্রোটন। আমি ক্রোটন ভালবাসি না, দেখিতে পারি না—আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমরাও ওগুলাকে না-ভালবাস, না-পছন্দ কর, দেখিতে না-পার। তোমরা কিনা,—গড়-গড়-গাড়ী তেতালা-বাড়ী বড় মানুষেরা, তোমরা কিনা,—বাগান-বায়ু-গ্রস্ত মধ্যবিধ বাবুরা, তোমরা কিনা,—গোলাপী-সৌখীন গৃহস্থ লোকেরা, তোমরা কিনা,—স্কুল-কাছারির আপিসের অধ্যক্ষেরা, তোমরা কিনা,—আধকাঠা উঠান পাইয়া সহরের সৌভাগ্যশালী বাসাড়িয়ারা, তোমরা কিনা,—একহাত রোয়াকে বসিয়া গুড়ুক-সেবী দোকনদারেরা,—আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা সকলেই ক্রোটনগুলা না-পছন্দ কর, আমার মত দেখিতে না-পার।

আমি যাহা ভালবাসি না, তাহা যে তোমাদিগকেও না-পছন্দ করিতে বলিতেছি,—ইহাতে তোমরা আমাকে ঘোরতর অহঙ্কারী মনে করিতে পার, বড় অনুদার—সঙ্কীর্ণমনা মনে করিতে পার; তোমাদের মনের দুয়ার দিয়া অনুমানের গতি আমি আমার ভাঙ্গা আগড় দিয়া আটক রাখিতে পারিব না; কিন্তু তোমরা আমাকে বড় অহঙ্কারী বা নিতান্ত

অনুদার মনে করিলে. আমার কাজ হাসিল হইবে না ; আমার কথা তোমরা রাখিবে না বলিয়া, একটা কথা আমাকে বলিতে হইতেছে। কথাটা এই যে, এমনও ত হইতে পারে যে, আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই, আমার চোখে জগতের ভাল-মন্দ দেখিতে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তোমরা সকলেই এইরূপ কর ;—যাহাকে ভালবাস তাহাকে বল না কি, "ছি ! ওসকল সামগ্রী তুমি ব্যবহার কর কেন ?" হয় ত সেইরূপ তোমাদের ভালবাসি বলিয়াই বলিতেছি. "ছি ! ছি ! ক্রোটনগুলাকে তোমরা অত আদর কর কেন ?"

ক্রোটনের পাঁচরঙ্গা পাতা, এই না তার গুণ ? ভাল. ওটা গুণ না দোষ ? তা বেশ করিয়া একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ দেখি।

এক একটি বর্ণে এক একটি ভাবের সুন্দর স্ফূর্ত্তি হয় ; সে বর্ণটি মিশ্র হউক. আর অমিশ্র হউক—এক এক প্রকারের বর্ণে এক একরূপ ভাবের পূর্ত্তি ও স্ফূর্ত্তি হয়। ঐ আকাশের আশমান্ রঙ্গে—দেখ. কেমন উদার ভাব, উদাস ভাব, ধীর-স্থির-গম্ভীর ভাব, সর্ব্ব-সামঞ্জস্য ভাব পরিস্ফূট রহিয়াছে। প্রান্তরের শ্যামল শোভা—উহাতেও তেমনি উদার ভাব আছে—কিন্তু সে উদাস ভাব নাই,—উহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। যেন ঢল ঢল করিতেছে ; সেই গম্ভীরতা আছে, তবু যেন সে ধীর-স্থির ভাব নাই,—বাতাসে দোলে. শিশিরে কাঁদে। জবাকুসুম-সঙ্কাশ কাশ্যপেয়ের মহাদ্যুতিতে প্রতাপ যেন গর্ গর্ করে, আবার এই শরতের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় জগৎ যেন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুস্বপ্নে হাসিতে থাকে।

শুদ্ধ হউক, মিশ্র হউক,—এক এক বর্ণের ভাবে এক একটি রাগিণী বাঁধা আছে। ঐ ক্ষুদ্র উদ্যানেই দেখ না কেন।—ঐ ধোয়াল রক্তবর্ণ পঞ্চমুখী জবা যে সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র—উদ্ভিদবতারে ফুটিয়া রহিয়াছে।

মহাশক্তির সেই প্রসন্ন বদনের করাল জিহ্বা, নর্তনশীল শ্রীচরণের কোকনদ-আভা, সেই বরাভয়দাত্রীর রক্ত-রঙ্গিণী-মূর্তি, রাগরঞ্জিত লোচনের ভীমা ভ্রূকুটি—যেন সকলগুলি মিলিয়া মিশিয়া, বর্ণগত হইয়া করুণ-রৌদ্রের পুষ্পাবতার হইয়াছে। মধুর বটে, কোমল বটে, শীতল বটে; মৃদু মৃদু দুলিতেছে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে,—কিন্তু কি রক্তরাগ, কি ভীষণ ভ্রূকুটি! যেন সহস্র সিংহচক্ষু কেন্দ্রীভূত হইয়া তোমার দিকে স্থির গভীর দৃষ্টিতে তোমার অন্তর পরীক্ষা করিতেছে। তুমি পাষণ্ড হইলে সেই অন্তর-পরীক্ষায় তোমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইবে; তুমি ভক্তিমান্ হইলে আপনা আপনি বলিবে,—

"রাঙ্গা জবা কি শোভা পায়—পায়!"

কোন্ পায়?—সেই মহাশক্তির পায়—

"যে ভ্রূকুটি-ভঙ্গে, সঙ্গিনী-সঙ্গে,
বামা কত রঙ্গে নেচে যায়॥"

বাস্তবিক ঐ পঞ্চমুখী জবা—ভ্রূকুটি-ভঙ্গময়ী, রঙ্গময়ী মহাশক্তির মহাপদারবিন্দে শোভা পায়; তাহাতেই ত বলিতেছিলাম—একটি ফুল ত ফুটিয়া নাই—যেন একখান তন্ত্রশাস্ত্র ফুটিয়া রহিয়াছে!

দেখ ঐ চাঁপা, দেখ ঐ টগর, দেখ ঐ অপরাজিতা। বিভিন্ন কুসুমের বিভিন্ন বর্ণের বৈচিত্র্য—চারি দিকেই মোহকর। চাঁপা সত্য সত্যই আলো করিয়া আছে। সোনার বরণ বলিলে চাঁপার অপমান করা হয়,—সোনা ঝক্ ঝক্ করে, চাঁপা তা করে না; চাঁপার চাক্‌চিক্য নাই; শোভা আছে, তাহে প্রভা নাই; আলো আছে, তাহে আভা নাই। যে প্রথমে বলিয়াছিল,—"সেই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, হেন মনে হয়, খোঁপায় রাখি।"—বোধ করি সে চাঁপা ফুলের সৌরভ

কিছু বুঝিয়া থাকিবে। সোনার অলঙ্কার চক্ চক্ করে, তাহা অঙ্গে ধারণ করিতে হয়; চাঁপা ফুল স্বভাবের সোনার গড়ন—তাহা মাথার মণি করিয়া খোঁপায় রাখিতে হয়।

টগরের ত কোন রঙ্গ নাই বলিলেও চলে; যাহাকে তোমরা রঙ্গ-রস বল, তাহার কিছুই টগরে নাই; অথচ দেখ দেখি কেমন সুন্দর! যে বলিয়াছিল, "শাদা মুলুক-জাদা"—সে অর্দ্ধ-কবি। যে বুঝাইয়াছিল যে, শ্বেত বর্ণই পবিত্রতা—সে মহা দার্শনিক, মহা কবি। টগরের ন্যায় অমল, ধবল পুষ্প—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাই বটে। বঙ্গের বাল্য বৈধব্য ব্রত যেন নীরবে বিরলে বসিয়া রহিয়াছে; তাহাতে হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রম —কিছুই নাই, কেবল পবিত্রতার অমলচ্ছদে স্বতঃই সুন্দর। ঐ দেখিলে বালবিধবা-ব্রহ্মচারিণীর বনবাসিনী মূর্ত্তি। আবার যখন দেখিবে, টগর প্রতিমা-সম্মুখে পুষ্পপাত্রে রাশীকৃত রহিয়াছে, একটু একটু চন্দনের ছিটা লাগিয়াছে—তখন বুঝিবে সেই ব্রহ্মচারিণীর দেবমন্দিরবাসিনী মূর্ত্তি! কুসুমের এ সকল মূর্ত্তি কি তোমাদের ভাল লাগে না? যদি লাগে, তবে কুসুমকান্তিশূন্য, শ্বেত্রীকুষ্ঠময় ওই পাঁচরঙ্গা পাতাগুলার অত আদর কেন? ওগুলা ফুলও নয়, পাতাও নয়, ওগুলা দুয়ের বাহির।

শ্রাবণ, ১২৯৪] [নবজীবন—৪র্থ ভাগ

২৮

সাধারণীর প্রশ্নোত্তর

১। প্রশ্ন। লর্ড রীপনের রাম-রাজত্বে অস্ত্র-বিধি উঠিল না কেন?

উত্তর। অস্ত্র-বিধি রাম-রাজ্যেও উঠে নাই, রীপন-রাজ্যেও উঠিবে না। বানরের জ্বালায়।

২। প্রশ্ন। ইলবার্ট-বিল-বিদ্বেষিগণ বে-আইনি গালিগালাজ করাতেও কেন সাজা পাইল না?

উত্তর। বে-আইনি গালিগালাজের সাজার কোন বিধি নাই। আইনি গালিগালাজের সাজা আছে। নজির in *re*. Surendranath Banerjee.

৩। প্রশ্ন। মাসিক পত্রিকার অর্থ কি?

উত্তর। গ্রাহক হইয়া যাহার টাকা ফাঁকি দিতে হয়। উদাহরণ—বঙ্গদর্শন।

৪। প্রশ্ন। বজ্জাত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা সংবাদপত্রে কেন ছাপা হয়?

উত্তর। "পশ্বাবলী" গ্রন্থ কেন ছাপা হয়?

৫। প্রশ্ন। মিরর-সাম্পাদকের নিকট সুরেন্দ্রবাবুর আপিলের যে টাকা জমা আছে, তাহার গতি?

উত্তর। প্রেতলোকে হইবে।

৬। প্রশ্ন। খোলাভাঁটি কি রূপে দেশের লোকের উন্নতির পরিচয় দেয়?

উত্তর। নানা রূপে—থানায়, ডোবায়, পগারে, বেগারে, রিপোর্টে ইম্পোর্টে।

৭। প্রশ্ন। আদালতের নাম ধর্ম্ম-অবতার কেন?

উত্তর। যমই ধর্ম্মরাজ। যেমন যমের কাছে কাহারও নিস্তার নাই, তেমনই আদালতের কাছে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। দোষি-নির্দোষ হক্‌দার-বেহক্‌দার—সব এক দশা। আম্‌লারা চিত্রগুপ্তের সন্তান; যমদূতের কৃষ্ণপক্ষের বংশে চাপ্‌রাশি।

৮। প্রশ্ন। রেলওয়েতে পয়সা দিয়া গলাধাক্কা কেন খাই?

উত্তর। খাবার জিনিষ পয়সা দিয়াই খাইতে হয়। শুনিতেছি হোঁচটেরও নাকি দাম হইবে। এখন থেকে পয়সা দিয়া হোঁচট খাইতে হইবে। এ উনবিংশ শতাব্দী এবং ইংরাজের রাজ্য।

শ্রীহযবরল।

৯ পৌষ, ১২৯০] [সাধারণী—২১ ভাগ, ৭ সংখ

২৭

ক্ষুদ্রের নিবেদন

কুঞ্চিত-কপাল, বক্র-নাসা, কেন ভাই! তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ? অত রাগ কেন? কে তোমার সুখে বাধা দিতে চাহিতেছে? কাহার অসদৃশ ব্যবহার-দর্শনে তুমি মর্ম্মে স্পৃষ্ট হইয়াছ? বুঝাইয়া বল না ভাই! আমি ক্ষুদ্র; তোমার ভ্রূকুটি-দর্শনে প্রাণে কাঁপিতেছি; সত্য করিয়া বল, তুমি কে? কাতরোক্তি শুনিয়া তোমার কি দয়া হইবে না? একবার প্রশস্ত ললাটখানিকে সরল করিয়া একটু অভয় দাও না ভাই! বহুকাল হইতে তোমাকে দুটা দুঃখের কথা বলিবার আছে, আজি বলিয়া লই; উত্তর চাহি না; কেবল তুমি শুনিলেই আমার যথেষ্ট হইবে। কই, মুখভঙ্গি ত সরল করিলে না? বুঝিয়াছি ওটি তোমার অভ্যাস-দোষ। যাক্, আমার [illegible]া বলিবার আছে, বলিয়া যাই; আশা করি তুমি শুনিবে।

আচ্ছা ভাই মহান্! তুমি আমাকে অমন করিয়া ঘৃণার চক্ষুতে দেখ কেন? আমার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠ কেন? আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য তুমি চিরকাল খড়্গহস্ত কেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি মহান্ হইলে কোন্ বলে? বল দেখি, কে তোমাকে বড় করিল? আমরা পাঁচজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি মিলিয়াই তোমাকে ঐ সোনামাখা গগন-প্রান্তে তুলিয়াছি। তুমি অস্বীকার করিবে, কিন্তু কথাটি সত্য। আমরা পাঁচটি

না থাকিলে, বল দেখি ভাই! তুমি কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকিতে? আমরা তোমাকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছি, কুপথ সুপথ বুঝাইয়া দিয়াছি, শেষ জননী যেমন আদরের শিশুকে উচ্চে তুলিয়া আমোদ করেন, আমরাও তেমনি কাঁধ পাতিয়া তোমাকে তুলিয়া ধরিয়াছি; তুমি প্রাণ ভরিয়া রঙ্গ করিতেছ, আমরা আঁখি ভরিয়া দেখিতেছি। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র বুদ্ধি, সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত আমরা ভালবাসাই বুঝিয়াছি। তোমার বৃহৎ বুদ্ধিতে তুমি বিপরীত বুঝিতেছ কেন? জগৎ যে কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে,—এ ভাব দেখাইতেছ কেন? আমরা আদর করিয়া যাহাই বলি, আদরের পক্ষপাতিতায়, অন্ধ-নয়নে আমরা যেরূপই দেখি না কেন, সত্যের সহিত সে সকলের মিল বড় অল্প; মহান্ হইয়াও তুমি এটুকু বুঝিতে পার না! তোমাকে স্নেহ করিয়া বলি যে, জগৎ তোমার জন্য; কথাটি সত্য মনে করিয়া মহত্ত্ব নষ্ট করিতেছ কেন? আসল কথা, সংসার তোমার আমার উভয়ের জন্যই সৃষ্ট;—আমি তোমার জন্য সৃষ্ট, তুমি আমার জন্য সৃষ্ট! বুঝিলে?

পদতলে তুমি যে তৃণগাছটি দলিত করিয়া গর্ব্বভরে চলিতেছ, সেই তৃণগাছটি তোমার নিকটে ঘৃণিত, হেয় বস্তু মাত্রেরই উপমাস্থল। তোমার উচ্চ চিন্তার কলঙ্কের কথা যে, তুমি এরূপ মনে করিয়া থাক। তৃণ কিন্তু নিরন্তর তোমার শত হিতে রত,—দিনে সহস্র বার তোমার ব্যথিত নয়নকে প্রশস্ত করিতেছে, চির জীবন সংসারকে তোমার বাসোপযোগী করিতেছে। আর তুমি না বুঝিয়া তৃণবংশ ধ্বংস করিতে তৎপর! আজি কদর্য্য-কলেবর ভূমি-শম্বুক তোমার চক্ষুঃশূল, কিন্তু দুই তিন দিবস পরে তাহা হইতে সুন্দর-কলেবর প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া

তোমার মনে স্বর্গের ছায়া অঙ্কিত করিয়া দিবে। মহান্! তুমি এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতে পার না বলিয়া সময়ে সময়ে তোমাকে ক্ষুদ্র বলিতে ইচ্ছা হয়।

ত্রিদিবেশ্বরী মহাশক্তি ক্ষুদ্রে বৃহতে মিশাইয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই যন্ত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয়েই উপযোগী; ক্ষুদ্রকে স্থানচ্যুত করিলে বৃহতের দ্বারা উপকৃত হইবে না। এমন সোজা কথা বুঝিতে পার না কেন ভাই, মহান্? যদি এমন হইত যে, তুমি এই বিশ্বযন্ত্রের ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালীর চরম ফল কি হইবে তাহা জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি যন্ত্র-সংস্কারের যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঘাড় নামাইয়া তাহাই অনুমোদন করিতাম। তুমি গর্ব্বিত বটে, কিন্তু বোধ হয় তোমার গর্ব্ব আজিও এত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই যে, তুমি "বুক ঠুকিয়া" বলিতে পার, "আমি সৃষ্টি-কৌশল, সৃষ্টি-কারণ বুঝিয়াছি।" তাই বলি, বিশ্বযন্ত্র যেমন চলিতেছে চলিতে দাও, নিরন্তর নিজ কার্য্যে রত থাক; বিশ্ব-গৃহ সংস্কারের জন্য সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া নিজের ও সংসারের ক্ষণিক অসুখ জন্মাইবার প্রয়োজন নাই। দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে, কোটী কোটী বৎসরের পরে মহাসমুদ্রে রামের মহাসেতু অটল হইয়া দাঁড়াইবে, আর সেতু-বক্ষে কি কেবল তোমার মহাপর্ব্বতগুলিই বিরাজ করিবে মনে করিয়াছ? কাষ্ঠবিড়াল-সঞ্চিত ধূলিকণাও সেই সেতুতে স্থান পাইবে। হইতে পারে, ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র কার্য্য কেহ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু সেই ধূলিকণাটি স্থানভ্রষ্ট হইলে সেতুটিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারিবে না। হনূমান্ কাষ্ঠবিড়ালের ধূলি-সঞ্চয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন,—অপুষ্কল কলেবর প্রাণীকে আঘাত করিতেও ক্রটি করেন নাই। ঈশ্বরাবতার রাম ব্যথিত প্রাণীকে অভয় দান করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ভাই মহান্! এ সংবাদটি কি তোমার কর্ণে কখনই প্রবেশ করে নাই?

আমরা ক্ষুদ্র. আমাদের আশা করিও না ; তোমার মহত্ব নষ্ট হইবে : আমাদের স্পর্শ করিয়া তোমাদের 'অমল-ধবল-কমল' কর কালিমা-ভূষিত করিও না। সংসারে আমরাও আছি, তোমরাও আছ ; আমরাও কার্য্য করিতেছি, তোমরাও কার্য্য করিতেছ ; আমাদের তাড়াইতে চেষ্টা করিয়া তোমরা যে সময় নষ্ট করিতেছ, সে সময়ের মধ্যে তোমরা আপনাদিগের কত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিতে। মাথামুণ্ড কার্য্যে তোমার যে সময়টুকু নষ্ট হইয়াছে, সে সময়ের মধ্যে তুমি হয়ত জগতের কত উপকার করিতে পারিতে। ভ্রমে পতিত হও কেন ভাই ? তোমরা বুঝিয়া কার্য্য করিলে আমরাও কার্য্যের ব্যাঘাত দেখিতে পাইব না, তোমরাও পাইবে না। আমরা এক মনে করিয়া কতকগুলি ধূলি সঞ্চয় করিলাম, তোমরা হাসিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিলে ; লোককে বলিলে, উহারা কাষ্ঠ-বিড়াল-জাতীয়। আমরা ঘৃণিত হইলাম, আমাদের বালুকণাদ্বারা উদ্দিষ্ট উপকার হইল না। তোমরা আড়ে-হাতে না লাগিলে আমাদের বালুকণা হয়ত সেতুপৃষ্ঠে স্থান (অলক্ষ্য) পাইত।

মনে রাখিও যে, সমুদ্র জলনিধি হইলেও সতত তৃষ্ণা হরণ করিতে সমর্থ নহে ; কূপ হইতেই প্রায়শঃ তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু বলিয়াছি ত আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর নাই। ক্ষুদ্র চির কালই মহৎকে উপদেশ দান করিয়া থাকে ; সেই জানিয়াই আজি এই চেষ্টা করিলাম। এখন বিদায়। বিদায়-কালে ভাই ! তোমার পায়ে পড়ি, একবার বদনখানি প্রশান্ত ও প্রফুল্ল কর—দেখিয়া প্রাণ জুড়াক্ !

চৈত্র, ১২৯১] [নবজীবন—১ম ভাগ

মহৎ—ক্ষুদ্রের প্রতি

হে ক্ষুদ্র! সাধু, সাধু! তুমি বলিতে শিখিয়াছ, তুমি সাধু! ভাই হে! তুমি আমার উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি প্রীত হইলাম,—আশীর্ব্বাদ করি—স্বস্তি, স্বস্তি! তুমি আমাকে বল দান করিয়াছ—আমাকে এই উন্নত গিরিশিখরে তুলিয়া দিয়াছ। কিন্তু ভাই! বল দেখি, তুমি রামকে না তুলিয়া, শ্যামকে না তুলিয়া, আমাকেই বা এত অনুগ্রহ করিলে কেন? আমি উঁচু হইব, ইহা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল—নয়? ভাল, যেন তাহাই হইল, এখন সে সাধ ফুরাইল কেন? আমি তোমাকে পদে দলন করিয়াছি বলিয়া? আমি আত্মম্ভরিতায় মুগ্ধ হইয়া, অহংতত্ত্বে পণ্ডিত হইয়া, আবার তাহার উপর, বুঝি, তুমি যে বল আমাকে ধার দিয়াছিলে বলিতেছ,—সেই বলে বলবান্ হইয়া তোমার সকেশ-মস্তক আহার করিয়াছি বলিয়া? ভাই হে! তুমি ভ্রান্ত।

তুমি রোমের ইতিহাস পড়িয়াছ কি? না হয়, কথামালা পড়িয়াছ কি? একদা উদরের সহিত বিপরীত কলহে সমুদায় অঙ্গাদি কি ঘোর বিপাকে পড়িয়াছিল, তাহার বার্ত্তা কি তোমার কানে উঠিয়াছে? 'উদর' না হইলে এত দিন রহিতে কোথায়? আমাকে তুমি বলই দাও, আর সৃষ্টিই কর, আর সংসারে এই উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতই কর, আমি চক্ষু বুজিলে ভাই! তোমারও গতি নাই! বুঝিলে কি?

আবার বলি, আমার ক্ষমতাটা কি তোমার এতই চক্ষুঃশূল হইয়াছে?

হইয়াছে বৈকি—নহিলে হাটে, ঘাটে, মাঠে,—হলে, স্কোয়ারে, ষ্ট্রীটে আজ কেবল নাকে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ কেন? অই যে ইংরাজীতে একটা কথা বলে—"Some must lead, while some must follow,"—এই প্রথা না হইলে সংসার চলিত না। দেখ, যত বড় বড় ব্যাপারে যেথানে যত সন্ন্যাসী সেথানে গাজন ততই নষ্ট। সবাই সমান হইলে, কাজ চলিবে কেন ভাই? তুমি বড় হইতে চাও, আইস; আমি আমার বড়ত্ব ছাড়িয়া দিয়া তোমার কুটীরে যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেথ দেখি, কত দিন তুমি আমার অবস্থায় থাকিয়া সুখী হইবে? আমাকে যদি তুমিই এ অবস্থায় তুলিয়া থাক, তবে তাহার জন্য আমি তোমায় বড় একটা আশীর্ব্বাদ করিতে প্রস্তুত নহি। কেন না, এ জায়গাটা বড়ই কদর্য্য না হইলেও বড় একটা রম্য উপবনের মত নয়। লোকে ভাবে, অই রজত-ধবল-স্ফাটিক স্তম্ভবৎ হিমাচলের অভ্রভেদী শিথর-দেশ—না জানি কত সাধের, কত সুখের! একবার গিয়া দেখিয়া আইস ত ভাই! বড় সহজ ব্যাপার নয় হে!

তুমি বলিবে, ঐ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে যে সুন্দর কি-যেন-কেমন-তর ছোট বড় মাজারি প্রজাপতি উড়িতেছে, তাহাদিগকেও আমাদের দেশে ছাড়িয়া দাও, মরিয়া যাইবে! ঠিক কথা, আমিও তাহাই বলি! যে পোকা হিমাচলে প্রজাপতি হইয়াছে, তোমার দেশে হইলে তাহারা মরিয়া যাইত—নয় ত মশক হইয়া শ্রবণ ও ত্বক্ পরিতৃপ্ত করিত। আমি—"আমি" হইয়াছি, "মহৎ" হইয়াছি (—তুমিই বল, 'আমি মহৎ') কেন? না, আমার উদরে ঘৃত সহ্য হয় বলিয়া। আর তুমি ক্ষুদ্র হইলে কেন?—তোমার মহৎ হইবার ক্ষমতা নাই, তাই। ক্ষমতা থাকিলে হয়ত আমাকে উপদেশ দিতে না বসিয়া আপনাকে উন্নত করিতে—আমার সমান

করিতে চেষ্টা করিতে। বেশ ভাই! তাই হও না। দুজনেই হইব। দেখি, তোমায় কেমন দেখায়! আইস, আমি তোমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত; কিন্তু ভাই! তোমার নিজের যেটুকু আবশ্যক তাহা আছে কি?

শ্রীমহৎ

[নবম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষুদ্রের নিবেদন' লইয়া বড়ই গণ্ডগোল উপস্থিত। বঙ্গসাহিত্যের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, এখনও অনেকের ধারণা আছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের উপর লক্ষ্য না থাকিলে, ওরূপ প্রবন্ধ লেখাই হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াই অনেকে ইঁহাকে তাঁহাকে ক্ষুদ্রের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এটি দুঃখের কথা; এ বিষয়ে হাসির কথাও আছে।

পূর্ব্বে কবির দলে কটূক্তির শ্লেষের লড়াই হইত। অকথ্য গালাগালি দিয়া এক দল অন্য দলের উপর চাপান গাহিলে, যাহাদের গালি দিয়াছে—তাহাদের বাঁধনদার, চোতাধারী, মূলদোহার মধ্যে বিবাদ হইত; প্রত্যেকেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত যে, সেই নিজে গালাগালির লক্ষ্য; কেন না, গুণের ধিক্কার, জাতির আবিষ্কার, পিতৃ-নিন্দা, গৃহ-কুৎসা তাহাকেই খাটে। কথা ●, যে গালাগালির লক্ষ্য হইল তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ প্রধান বলিয়া স্থির করিয়াছে। এইরূপে প্রধান হইবার এখন আবার সময় উপস্থিত। ক্ষুদ্র বলিতেছে মহৎকে, লক্ষ্য আমি,—কাজেই আমি মহৎ। এইরূপে মহৎ হইবার সুযোগ অনেকে ছাড়িতে পারিতেছেন না! কথাটা হাসির কথা বটে; তবে আসল কথা বলিতে গেলেই সকল ফাঁকা হয়। লেখকগণ আমাদের পরিচিত নহেন এবং লক্ষ্য কাহারও উপর নাই।—নবজীবন-সম্পাদক।]

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২] [নবজীবন—১ম ভাগ

৩১

সিংহের উপাধি-বিতরণ

কস্মিংশ্চিদ্বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম। কদাচিৎ তাঁহার প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, "হে পশুপতি! মনুষ্যলোকে রাজবর্গ আপন আপন প্রজাবর্গকে এক্ষণে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিতেছে। অতএব পশুলোকে কেন তাহা হইবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব হে শ্বেত-পুরুষ-সাম্রাজ্য-ধ্বজ-বিহারিন্ মহাকেশরিন্! শশমূষিক-চর্ব্বণকারিন্! প্রসীদ! প্রসীদ! প্রসন্ন হও! আমাদের উপাধি প্রদান কর। তোমার মসৃণ কেশরদাম চির-কুঞ্চিত হউক। তোমার শিলাস্ফালন-কর্কশ মহা লাঙ্গুলের চিরন্তন পরিপুষ্টি হইতে থাকুক।" (৫)

তখন পশুরাজাধিরাজ শ্রীমান্ ভাসুরক দংষ্ট্রাময়ূখ-জালে গিরি, গহ্বর, কানন, কুঞ্জ, কান্তার প্রভৃতি প্রভা-ভাসিত করিয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, উপাধি ব্যতীত তোমাদিগের এই সকল দীর্ঘায়ত, শ্রীমান্, কোমল, বিচিত্র এবং লোমশ লাঙ্গুল সকল ফলশূন্য লতার ন্যায় এবং পতাকাশূন্য বাঁশের ন্যায় জনসমাজে সম্যক্ সম্মানিত হয় না। অতএব হে বনচারিবৃন্দ! তোমরা উপাধি গ্রহণ কর।"

তখন সেই কাননারণ্য-প্রমথনকারী বনচারিবৃন্দ সহস্র সহস্র জিহ্বা নিষ্ক্রামণ-পূর্ব্বক তুমুল গর্জ্জনের সহিত রাজাজ্ঞার অনুমোদন করিল। তখন কাননেশ্বর শ্রীমান্ ভাস্বরক যথাবিধি উপাধি-শাস্ত্র অবগত হইয়া প্রজাবৃন্দকে উপাধি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

পশুশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রকে অগ্রে সম্বোধন করিয়া মৃগেন্দ্রবর আজ্ঞা করিলেন, "হে শার্দ্দূল! বলে, ছলে, কৌশলে তুমি সর্ব্বপ্রধান। আহারে, প্রহারে, সংহারে এবং অপহারে তোমার তুল্য কেহই নাই। তুমি দংষ্ট্রী, তুমি নখী, তুমি চোর এবং তুমি গর্জ্জনকারী,—এজন্য অগ্রে তোমাকেই উপাধি প্রদান করিব। এই ভারতভূমে সর্ব্বপ্রদেশই রাত্রিকালে তোমার ভয়ে ভীত, স্বল্প-পরিমিত নাগরিক প্রদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই রাত্রিকালে তোমার আয়ত্ত। এজন্য আমি তোমাকে উপাধি দিলাম—Night Commander of the Indian Empire."

ব্যাঘ্র মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে রাজপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিলেন। তখন রাজা সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বিষধরবর! তুমি মহাবীর, তোমার তুল্য বীর আর দেখি না। বরং ব্যাঘ্রের নখদংষ্ট্রা হইতে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু তোমার বিষ-দন্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। শত্রু-বধে তুমি এই মহাবলবিক্রমশালী শার্দ্দূল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে জানা যায়। শার্দ্দূল কেবল বনে বনে শত্রু নিপাত করেন—কিন্তু তুমি গৃহে গৃহে! এই ভারতভূমে রাত্রিকালে কে তোমার সঙ্গ ছাড়া? অতএব হে নিঃশব্দ-সঞ্চারী রাত্রিচর তোমাকে—Night Companion of the Indian Empire উপাধি দেওয়া গেল।"

ক্ষুদ্রজীবী ভুজঙ্গের এরূপ সম্মানে প্রধান প্রধান পশুগণ অসন্তুষ্ট ও

বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন মহাকায় ভল্লুক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি উপাধি পাই না?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ভল্লুক বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি The Great Bear." তখন পশুরাজ বলিলেন, "আর পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি হইলে—Grand Commander of the Star of India."

ভল্লুক একটি মার্জ্জারকে দেখাইয়া বলিল, "এই কাবুলী বেরালটির কি হইবে? এটি আপনারই আশ্রিত।" পশুরাজ বলিলেন.—"Companion to the Star of India."

কুক্কুর বলিল, "তবে আমি কি?" পশুরাজ বলিলেন,—"Companion to the Comets of India."

এইরূপে অন্যান্য পশুগণ নানাবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইলে পর, সভাস্থ গর্দ্দভমণ্ডলী সহসা ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বিকট শব্দ, দীর্ঘ কর্ণ, আরূঢ় কেশর এবং স্থূল উদর দর্শন করিয়া রাজা সভাপণ্ডিতের নিকট কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন রাজ-সভা-পণ্ডিত নিবেদন করিলেন যে, উহারা উপাধি প্রার্থনা করে। পশুরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? এই মূঢ়েরা কি উপাধি পাইবার যোগ্য?"

সভাপণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহারা মূঢ় বটে। মূঢ়ের গুণ বিচার করিয়া উপাধি প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক।"

পশুরাজ। সে কি প্রকার?

সভাপণ্ডিত। মুহ্‌ ধাতু হইতে মূঢ় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূঢ়ের গুণ—মোহ।

শুনিয়া মৃগেন্দ্রবর আজ্ঞা করিলেন, "ইঁহারা মহামোহোপাধ্যায় হউন।"

শুনিয়া গর্দ্দভ-মণ্ডলী তুমুল ঘ্যাঁকঃ ঘ্যাঁকঃ শব্দ করিল। মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন আর কতকগুলি সভ্যতা-ব্রত-নিষ্ঠ উচ্চাসনস্থিত সভাসদ্ বৃক্ষশাখা সকল হইতে কোমল-বল্লী-সন্নিভ দীর্ঘ সংসর্পিত লাঙ্গুল-শ্রেণী বিমুক্ত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীমণ্ডল পবিত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগের হেম-কলধৌত-সন্নিভ মসৃণ লোমাবলী, অন্ন-পাকে নিয়ত-গভীর-কৃষ্ণ-হণ্ডিকা,—তত্তুল-সদৃশ বদনমণ্ডল ও করচরণ এবং সর্বোপরি আনন্দোৎসব-দিবস-রস-বিকাশকারী পতাকা-শ্রেণী-তুল্য উর্দ্ধোত্থিত লাঙ্গুলমালা সন্দর্শন করিয়া কেশরিরাজ প্রীত হইলেন এবং প্রীতিব্যঞ্জক হাস্য-হুঙ্কারে কানন-বিটপী সকল কম্পিত করিয়া কহিলেন, "ভো ভো বানরাঃ! অহং প্রীতোঽস্মি। তোমরাই আমার রাজ্যের গৌরব। তোমরা প্রভুভক্ত, রামচন্দ্রাদি প্রাচীন রাজগণ তাহার সাক্ষী; তোমরাই ধনবান্, কেন না তোমরা গাছেরও পাড়', তলারও কুড়াও এবং তোমরাই আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ,—কেন না, ডালে ডালে বেড়াও। আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে উপাধি-বিশিষ্ট করিতেছি—তোমরা 'মহারাজা' এবং 'রাজা-বাহাদুর' বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিখ্যাত হইবে। তোমাদের জয় হউক; তোমরা স্বচ্ছন্দে কিচির মিচির কর এবং পুরুষানুক্রমে লাঙ্গুলবিক্ষেপ-বিসর্পাদির দ্বারা বনবাসিবৃন্দের মনোহরণ করিতে থাক।" তখন কিচির মিচির, হুপ্ হাপ্ ইত্যাদি কৈষ্কিন্ধ্য জয়ধ্বনিতে রাজারণ্য পরিপূর্ণ হইল।

উচ্চস্থ মহাশয়দিগের অভিনন্দন-নিনাদ কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে রাজা প্রতিহার-ভূমে কিঞ্চিৎ অস্ফুট এবং দীন-ভাবাপন্ন কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন। প্রতিহারিবর্গ ছুঁচাকে সেই মহা সভাতলে সমাগত দেখিয়া রুষ্টভাবে

তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সর্ব্বসমদর্শী সেই পশুনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন, "এই পশুকে তোমরা গুণহীন বা উপাধির অযোগ্য বিবেচনা করিও না। ইনি বিনীত, লজ্জাশীল এবং সৌরভ-পরিপূর্ণ। বিশেষ ইনি ধনবান্। অনেক গোলা লুঠ করিয়া ইনি ধন-ধান্যে আপনার বিবর পরিপূর্ণ করিয়াছেন। অতএব মনুষ্যলোকের প্রথানুসারে ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করা গেল।"

তাহার পর, মহা কোলাহলের সহিত সেই মহতী রাজসভা ভঙ্গ হইলে, সভ্যগণ উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া স্ব স্ব বিবরাভিমুখে গমন করিলেন।

চৈত্র, ১২৯৩]   [নবজীবন—৩য় ভাগ

৩২

চনকচূর্ণ

(অনাদায়)

চনকচূর্ণ লিখিব কি?—বরদা রাজ্যের রাজপাট গেল শুনে মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। তাই একলাটি ব'সে ভাবিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে পাঁচালীর গানটা মনে পড়িল,—

"হ'ল একি দায়, কেমনে বিদায় দিব বরদায়?"

—এত যে দুঃখ, পোড়া মুখে একটু হাসি আসিল। অনুপ্রাসের এমনি অচিন্তনীয়া, অকথনীয়া, অবর্ণনীয়া শক্তি। এমন অনুপ্রাস-বিন্যাসের নাশ করিতে যারা প্রয়াস পায় তাহাদিগকে শ্বাস-কাশ গ্রাস করুক।

যাহা হউক, মুখে হাসি আসিতেই মনে হইল যে, দেবতায় অকালে শিলাবৃষ্টি করিতে পারেন, আমরা চেনাচুর বেচিতে পারিব না—সে কি? মল্‌হার রাও * কারাগারে মরে মরুক—আমি আজ চেনাচুর লিখিব।

এইরূপে 'বরদায় বিদায়' দিলাম, কিন্তু তখনই হৃদয়-মধ্যে আমাদের সাবেক দুঃখ,—চিরকালের দুঃখ তুবড়ী বাজীর মত ফুটে উঠিল। নতুন আউশ বিচালি উঠ্‌লে যেমন একবার পুরাণ' বিচালির দর কমিয়া যায়,

---

* বরদা রাজ্যের গায়কাবাড়। ইনি ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বরদার রাজা হন এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী বরদার ইংরাজ রেসিডেণ্ট আর ফেয়ারকে বিষ-প্রয়োগের অপরাধে রাজ্যচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু নতুন বিচালি ফুরাইয়া গেলেই আবার সাবেক দর চন্ চন্ করিয়া বাড়িয়া উঠে, আমাদের পুরাণ দুঃখ সেইরূপ চন্ চন্ করিয়া বাড়িয়া উঠিল। দুঃখ বাড়ুক, কিন্তু উপমাটা নিতান্ত গ্রাম্য এবং নির্ধনের উপমা হইল; দেখা যা'ক একটা সহুরে এবং বড়-মান্যা উপমা দিতে পারা যায় কি না। যেমন—যেমন—উঁ—যেমন সহরে—এইবার হয়েছে—যেমন সহরে নূতন 'লোন্' খুলিবা মাত্রই সাবেক কাগজের দর কমিয়া যায়, কিন্তু নূতন লোন্ ফুরাইবা মাত্রই আবার সাবেকের দর বাড়িতে থাকে, সেইরূপ বরদা রাজ্যের দুঃখ অনুপ্রাসের গুণে ভুলিবা মাত্রই, আমাদের মকুররি দুঃখ অমনি যেন (আর তুবড়ি বলিলে ভাল দেখায় না)—অমনি যেন ডেঙ্গুজ্বরের মত চাপিয়া ধরিল।

দুঃখটা কি জানেন—সাধারণীর মূল্যের অনাদায়। এই দুঃখে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন সম্পাদক, প্রকাশক, কার্য্যাধ্যক্ষ,—সাধারণীর যক্ষ, রক্ষ, লক্ষ—সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। অহং সম্পাদকস্য দক্ষিণ-হস্ত, ময়ি অসুস্থে সর্ব্বে ব্যস্ত। সকলে বলিলেন,—"চেনাচুর মহাশয়! আপনি অমন হ'য়ে পড়িলেন কেন?" আমি মনের দুঃখ মনে রাখিয়া বলিলাম,—"অনাদায়, অনাদায়, অনাদায়!" সম্পাদক বলিলেন,—"তা'র ভাবনা কি? আমি আর্টিকেল্ লিখিলেই আদায় হইবে।" আমি বলিলাম, "একবার ১১ই শ্রাবণ *

---

* "আজি সাধারণীর নূতন যন্ত্রে সাধারণী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আজি আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা পাঠকে কখনই বুঝিতে পারিবেন না; যিনি মনের ভাব বুঝিবেন না, তাঁহার কাছে মনের ভাব বলিবও না। তবে একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে,—এত দিন পরে সাধারণীর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিতে

সাধারণীর যন্ত্র আনাইয়া ত আর্টিকেল্ লিখিয়াছেন,—'ভিক্ষা করি, প্রার্থনা করি, অভিধান করি, শব্দকল্পদ্রুম করি,' এ সকলই বলিয়াছিলেন, কই আদায় কিছুই হইল না।" তখন সম্পাদক নীরব হইলেন। তিনি আমার ঔদাস্যে দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিলেন,—"আমি একটি "বিশেষ বিজ্ঞাপন" দিতেছি,—তাবৎ টাকা আদায় হইবে।" আমি বলিলাম, "তাও ত ১২ সংখ্যার * কাগজে দিয়াছিলেন, তা কোন ফলই ত হইল না।" প্রকাশক বলিলেন,—"দু'বার দশ বার দিতে দিতেই

গ্রাহক-পাঠককে আমরা প্রশান্ত মনে অনুরোধ করিতে পারি। সংসারে যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র-পরিবার-পরিবেষ্টিত, তাহাকে যেমন অধিকতর বিশ্বাস হয়, অধিকতর বিশ্বাস করা কর্তব্য, তেমনই আমাদের সাধারণী যখন এক্ষণে কল, কারখানা, ছাপাখানা লইয়া জড়ীভূতা হইয়া পড়িল, তখন সকলের ইহাকে অধিকতর বিশ্বাস করা কর্তব্য। এত দিন পরে আমরা প্রকৃত মাল জামিন দাখিল করিলাম; এখন সাধারণের অধিকতর শ্রদ্ধা প্রার্থনা করি; কৃতবিদ্যের সহায়তা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ-সহকারে আহ্বান করি; পাঠকের অধিকতর মনোযোগ দেখিতে ইচ্ছা করি; আর, যে সকল মহোদয় এ পর্য্যন্ত সাধারণীর মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা আমাদের এই অভিনব যন্ত্র-স্থাপনের সুখে সুখী হইয়াই হউক, অথবা এই যন্ত্রের যে অর্থ-যন্ত্রণা তাহা হৃদয়ঙ্গম করত আমাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়াই হউক,—যে কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের দেয় ও আমাদের প্রাপ্য কালবিলম্ব না করিয়া প্রেরণ করিবেন,—ঐরূপ আশা করি, ভরসা করি, ইচ্ছা করি, প্রার্থনা করি, ভিক্ষা করি, সব করি।"

—সাধারণী, ২ ভাগ, ১৩ সংখ্যা; ১১ই শ্রাবণ, ১২৮১।

* "বিশেষ বিজ্ঞাপন * * * অনেক গ্রাহকের স্থানে এক বৎসরের মূল্য পাওনা হইয়াছে; তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন*; পৃথক্ তাগাদা করিতে গেলে কাষ্য ও ব্যয়বাহুল্য হয়। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধারণীর কার্য্যাধ্যক্ষ।"

—সাধারণী, ৩ ভাগ, ১২ সংখ্যা; ৫ই মাঘ, ১২৮১।

হইবে।" আমি বলিলাম, "দশ বার যদি বিজ্ঞাপন দিলেন ত 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' কিরূপ হইল?" প্রকাশক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। তখন কার্য্যাধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া আমায় সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন,—"আমি বিল করিতেছি, বিল পাঠাইলেই টাকা আদায় হইবে।" আমি বলিলাম,—"টাকা আদায় কিছুমাত্র হইবে না, উপরন্তু আরও দু'পয়সা ক্ষতি হইবে।" কার্য্যাধ্যক্ষ নীরব। সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন; অবিরল অশ্রুবারি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সকলে তারস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! অনাদায়!" সেই বাষ্পবারি সম্পাদকের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ বহিয়া ঝরিতে লাগিল,—

"চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা।"

তখন আমি আপনার সেই আগাধ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরদুঃখ-প্রপীড়িত হৃদয়ে ঈষৎ উত্থিত হইয়া বলিলাম,—"একটা কাজ করিলে হয় না?" সকলে আগ্রহাতিশয়-সহকারে বলিলেন,—"আপনি কি করিতে বলেন?" আমি বলিলাম, "পাঠক-মহলে চেনাচুরের বিলক্ষণ আদর আছে, আমাকে সকলেই আদর করেন। আমি বলি, আমি একটা চনকচূর্ণ লিখি, লিখে আমাদের দুঃখের কথা জানাই।" সকলে উত্তর করিলেন,—"দুঃখের চেনাচুর ভাল হইবে কেন?" আমি উত্তর করিলাম, "রসের ভিজা চেনাচুর ভাল বটে, কিন্তু দুঃখের শুকা চেনাচুর মন্দ নয়।" সকলে বলিলেন,—"তথাস্তু"। আমি অমনি ডাকিতে লাগিলাম। ঘসিরামের পিতামহ ভারতরায়ের ছড়া সকল উচ্চৈস্বরে আওড়াইতে লাগিলাম।

সভাজন শুন, গ্রাহকের গুণ, পড়িতে আগ্রহ দড়।
পড়া হ'লে শেষ, পৈসা দিতে ক্লেশ, মনের আক্ষেপ বড়॥

চনকচূর্ণ

'সপ্তা' 'হপ্তা', 'সিন্ধু' 'হিন্দু' এক যদি হয়।
'গ্রাহক' 'গ্রাসকে' তবে ভেদ কেন রয়॥

শুন গো গ্রাহক কি তব রীতি।
টাকা দিবে নাক' এ কোন্ নীতি॥

শুন গ্রাহক-নিচয় শুন গ্রাহক-নিচয়।
রোকা কড়ি চোকা মাল জানিহ নিশ্চয়॥

দাম দাও, নাম চাও, শুদ্ধ ভস্ম ছাই রে।
মূল্য দেয়' শীঘ্র দেয়—হেন লোক নাই রে॥

কে সুহৃৎ বিপরীত যেই রীত কাল।
সাড়ে ছয় *—নয় নয়, কিছু হয় ভাল॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে মূল্যটা দে।
ত্বরা দে, ত্বরা দেয়' টাকা কটা দে॥

যদি মূল্য মিলে হয় হর্ষ মনে।
অতি কাতর তোটক ছন্দ ভণে॥

১৯ মাঘ, ১২৮১] [সাধারণী—৩ ভাগ, ১৪ সংখ্যা

* সাধারণীর বার্ষিক মূল্য ৬৷৷৹ টাকা ছিল।

৩৩

জন্তু-ধর্ম্মী মানব

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে বাঙ্গালি বালক 'বোধোদয়' হইবা মাত্র জানিতে পারে যে, মনুষ্য একটি জন্তু-বিশেষ। তাহার পর, আর দশ বৎসর না যাইতেই করুণাময়ী ঠাকুরমার প্রসাদে যখন একটি পট্টবাসজড়িত, হরিদ্রা-রঞ্জিত নয়-বৎসরের বালাজন্তু আপনার শয্যা-ভাগিনী-রূপে প্রাপ্ত হয়, তখন নরনারীর পশুভাব সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে থাকে। তাহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত যুবা ডার্বিনের মন্ত্র-শিষ্য। মনুষ্যের পশুত্ব—এখন ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাজেই স্বদেশী বিদেশী মহামহা পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ-অনুসারে, আর পিতামহীর প্রখর দূতীত্বে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, আমরা একরূপ জন্তু-বিশেষ,—আমরা নিতান্ত পশু-ধর্ম্মী।

আমরা সেই পুরাণ' কথাটা আবার নূতন করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব, —তোমরা কেহ রাগ করিও না; করিলে—আমাদের কথাই প্রতিপন্ন হইবে, রাগ—পশু-ধর্ম্ম। আর রাগই বা করিবে কেন? বালক-কাল হইতে উপর্য্যুপরি এত শিক্ষা পাইয়াও, যদি মনুষ্যের পশুত্বে তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তোমার গৃহ-প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রবন্ধ পাঠ করিও, তিনি অবশ্য 'বিশেষণে সবিশেষ' তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতেও যদি কিছু সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এই প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একবার দেখা করিও, সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।

জন্তু-ধর্ম্মী মানব

জন্তু নানাবিধ; মনুষ্য-জন্তুও নানাবিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য-জন্তু আছে। সকল প্রকার পশু-ধর্ম্মীর বা পক্ষি-ধর্ম্মীর লক্ষণ বুঝাইতে গেলে পুথি বেড়ে যায়,—আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব মাত্র। বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকা স্বজন-বন্ধুবান্ধবের সহিত জু-বাগানে গিয়া ষ্টকের সহিত আমদানি মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইবেন।

তত্র পক্ষি-ধর্ম্মী

প্রথমে পুরাণেতিহাসে প্রসিদ্ধ, সর্ব্বপরিচিত শুক পক্ষীকেই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক।

শৌকেয় শ্রেণীস্থ মনুষ্য—দেখিলেই বলা যায়। এই শৌকেয় শ্রেণীস্থ লোককেই লোকে শৌখীন বলে। কিন্তু শৌখীন না বলিয়া শৌকীন বলিলেই ঠিক ব্যাকরণ-দুরস্ত হয়। ইঁহাদের নাকটি বককুলের কুঁড়ির মত টীকল,' বাঁকল', ঘোরাল'। চোখগুলি ছোট ছোট কুঁচের মত,—মিটি মিটি জ্বলিতেছে। গাটি বেশ চোম্‌রান' ; মাথাটি বেশ আঁচ্‌ড়ান',—সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার রাখিতে ব্যস্ত। প্রায়ই শিকলে বাঁধা আছেন, তখন চানা-ছোলা লইয়াই মত্ত; না হয়, মন্দিরের কোটরে,—তখন দেব-দেবতার মাথায় নৃত্য করিতেছেন। চিরজীবন শিকলে বাঁধা আছেন, কিন্তু আপনার ভ্রূকুটি ছাড়েন না, ছোলার খোসা না ফেলিয়া খাইতে পারেন না ; দুধের সর একটু বাসি হইলে অমনই সেই বাঁকা নাক আরও বাঁকাইয়া বসেন। ইহার নাম শৌকীন বা শৌখীন রুচি।

যে বোল্ শিখাইয়া দিবে, দেখিবে তালে বেতালে—সময়ে অসময়ে, কেবল তাহাই কপ্‌চাইতেছেন। রাধাকৃষ্ণই বলুন, আর কালী-কল্পতরুই নাম করুন, অথবা শিবজগদ্‌গুরু বলিয়াই চীৎকার করুন, দেব-দেবতার

জ্ঞান ইঁহাদের সকল সময়েই সমান; দেব-দেবতার উপর ভক্তিও সেইরূপ,—ভক্তি করেন, ভালবাসেন—কেবল দাঁড়টি আর ভাঁড়টি। সেই মিটি মিটি কুট্ কুটে চোখ দুটি দিয়া ধানটি ছোলাটি অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন; সেই বাঁকা ঠোঁট দিয়া 'অপত্য-নির্ব্বিশেষে' ছোলাগুলির খোসা ছাড়াইতেছেন, আর নিকটে কেহ আসিলেই, সেই চক্ষুতে একবার আড় চোখে চাহিয়া বলিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ"। ইহাকেই বলে, শোকীন বা শৌখীন ভক্তি।

ছেলেপিলে কাছে গেলে কঠোর ঠোকরে রক্তপাত করিতে শুকলাল বড় মজবুত। শোকীন বাবুরা বলেন যে, বালক-বালিকার শাসনই গৃহ-সংসারের সার ধর্ম্ম, নিকটে বাগে পাইলেই ঠোকর দিবে; আর সবল লোকে ধরিলেই চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিবে। তখন রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন যে, চীৎকারই শোকীন পলিটিক্স। শুকরাজ চিরজীবন শিকল কাটিতেই নিযুক্ত, পরিশ্রম প্রায়ই বৃথা হয়; কচিৎ যদি শিকল কাটা হইল, তাহা হইলে হয়ত নিজে তাহা বুঝিতে পারেন না; কর্ত্তা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ধরিয়া ফেলিলেন, আর শিকলটি খুব মজবুত করিয়া দিলেন; আর না হয় ত, কাটা শিকল পায়ে বাঁধা একবার উড়িয়া গাছে বসিতেই ডালে জড়াইয়া গেল। আবার ধরিয়া আনিল, অথবা অনাহারে মরিলেন, কিম্বা শিকারীতে মারিয়া ফেলিল। পায়ে শিকল লাগান' শৌখীন স্বাধীনতা এই রূপই জানিবে।

শুক-সংবাদের একটি 'পুরাণ' গল্প মনে পড়িল। একজন জুয়াচোর একটি শুক-পাখীকে একটি মাত্র বোল্ শিখাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পাখীটি কেবল মাত্র বলিতে পারিত, "তাহাতে সন্দেহ কি?" একজন ক্রয়ার্থী জিজ্ঞাসা করিল,—"এই পাখীটির দাম কত হইবে?"

বিক্রেতা বলিল, "পাঁচ শত টাকা,—হয় না হয়, পাখীকেই জিজ্ঞাসা করুন।" ক্রয়ার্থী বলিল, "কেমন তুতি! তোমার মূল্য অত হইবে কি?" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" লোকটি বিস্মিত হইয়া পাঁচ শত টাকা দিয়াই পাখীটি বাড়ী লইয়া গেল; তাহার পর বুঝিল যে, পাখীটি ঐ একটি মাত্র বোল্ জানে। তখন এই বোলে কান ঝালা-পালা হইলে, পাখীর নিকটে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ!" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" ইহা শুনিয়া পক্ষি-ক্রেতা যেমন কপালে ঘা মারিয়া হাস্য করিয়াছিল, আজি আমরাও সেইরূপ কপালে ঘা মারিয়া সেইরূপ হাসিয়া বলিতেছি—"আমরা এত টাকা দিয়া যে একটি মাত্র বোল্ কিনিতেছি, আমরা কি নির্ব্বোধ!" ঐ শুন, চারি দিক্ হইতে শৌকীন ভায়ারা একজোটে, বক্র-ঠোঁটে বলিতেছেন,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

এইরূপ কাক, পেঁচক, কুক্কুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষি-ধর্ম্মী মানব আছে।

তত্র পশু-ধর্ম্মী

পশুর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গৃহ-পালিত বিড়াল গৃহীত হইল।

বাঙ্গালায় বিড়াল-ধর্ম্মী পুরুষ বিস্তর আছেন। তবে চতুষ্পদ ও দ্বিপদ বিড়ালে একটু প্রভেদ আছে। চতুষ্পদের এলাকা, অধিকার, আব্দার —ভিতর বাড়ীতেই বেশী, আর দ্বিপদের দখল, দাবি, দৌরাত্ম্য,—বহির্বাটীতে অধিক। অন্তর্বাটীতে দেখিবেন, একটু বেলা হইয়াছে আর বিড়াল অমনই গৃহিনীর গোল মলে ঠেশ্ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই তাঁহার পদ-যুগলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছে, আর বিনম্র সলোম

লাঙ্গুল-সঞ্চালনে তাঁহার পদসেবা করিতেছে। বাহিরে দেখিবেন, কর্ত্তার দক্ষিণে বামে দুইজন পুরুষ-মার্জ্জার বসিয়া আছেন; একজনের হস্তে "বঙ্গবাসী",—তিনি মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার চুল্‌কণাগুলি খুঁটিয়া দিতেছেন। চক্রবর্ত্তীর উহাতে বড় আমোদ হয়। অপর দিকে পাল মহাশয় স্বয়ং পাথার বাতাস খাইতেছেন বটে, কিন্তু দূতীর গুণে বাজনী কর্ত্তার দিকেই অভিসারিকা। গৃহস্থ রোমশের লাঙ্গুল-সেবার আর বহিঃস্থ চক্রবর্ত্তীর চুল্‌কণা খুঁটিবার স্পৃহার এবং পাল মহাশয়ের পাথার ভঙ্গির—একই কারণ।—সময়ে কাঁটাটা, গুঁড়াটা; মাছটা, মুড়াটা।

বিড়াল বড় বাস্তুপ্রিয়। বাস্তুতে বস্তু থাকিলে বিড়াল কখন তাহা ছাড়িতে বা ভুলিতে পারে না। থোলের ভিতর পূরে, নানা লাঞ্ছনা ক'রে, উড়ে মালীর মাথায় দিয়া, (বিড়াল কাল তাঁহার মাছ খাইয়াছিল, তাই তাহার এত ত্যাগ-স্বীকার) বিড়ালকে গ্রামান্তর করিয়া দিয়া আইস,—এক দিন পরে দেখিবে, বিড়াল শুষ্কমুখে, রুক্ষদেহে, একটু ভয়ে, একটু আহ্লাদে, অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষুতে অন্তর্বাটীর গোজলা দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। এদিকেও দেখ চক্রবর্ত্তীকে শত গঞ্জনা দিয়া নবীনবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চাপাইয়া, বেহারে কণ্ট্রাকটের কার্য্য করিতে দেশান্তরিত করা গেল; দশ দিন পরে দেখিবে চক্রবর্ত্তী—তেমনই শুষ্ক-মুখে, রুক্ষদেহে বৈঠক্‌খানায় উঁকি মারিতেছেন। বলেন, "পটোল নাই, উচ্ছে নাই,—কেবল কাঁকুড়; রাত্রিদিন পেট গড়্‌ গড়্‌ করে, সেখানে কি থাকা যায়?"

বিড়াল বড় বেঁাচা। ঘৃণা-পিত্ত নাই বলিলেই হয়। খোকার দুধের বাটিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া এই মাত্র গৃহিনী তাঁহার সেই দুর্জ্জয়-দমন প্যাকান' বালার বাঘমুখো খোব্‌না দিয়া তাহার খোঁতা মুখ ভোঁতা

করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আবার ঐ দেখ,—এখনই ফিরিয়া আসিয়াছে, —স্কুলের ছেলেদের পাতের পার্শ্বে জানু গাড়িয়া বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও ত কম খোয়ার হয় না! সেদিন বড় বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া চক্রবর্ত্তী বরফ খাইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তা কি লাঞ্ছনাই না করেন! সকলেই মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর দশ দিন এ মুখো হ'বে না, তা কৈ? সন্ধ্যার পর সেই সমানে আসিয়া কর্ত্তার পার্শ্বে তেমনই জল-যোগ হইল। আহা, পেটের দায়ে যাহারা এত নির্ঘৃণ, তাহারা চতুষ্পদই হউক, আর দ্বিপদই হউক, কে তাহাদের উপর দয়া না করিবে বল?

বিড়াল বড় আয়েসী। খাওয়া আর শোয়া—এই দুইটাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। যেটুকু বসিয়া থাকা, তাহা হয় কেবল খাবার প্রত্যাশায় বা উমেদারীতে, না হয় আঁচাইবার জন্য। অন্তঃপুরে দেখিবে, এই গ্রীষ্মের দিনে বিড়াল নীচে তলার নিভৃত ঠাণ্ডা মেজেতে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; বহির্বাটীতে দেখিবে, পাল মহাশয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে, পাটি বিছাইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতেছেন। শীতকালে দেখিবে, অন্তঃপুরে আধ্‌ছায়া আধ্‌রৌদ্রে শুইয়া বিড়াল লেজ নাড়িতেছে; বহির্বাটীতে পাল মহাশয় রৌদ্রে পীঠ দিয়া তামাকুর অন্ত্যেষ্টি করিতেছেন। হা পেট্! তোমার দায়ে এ হেন বিলাসীকেও ইন্দুরের বিবর-পার্শ্বে ওৎ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! তোমার দায়ে পাল মহাশয়কেও পাক করিতে দেখিয়াছি!

বিড়াল ভণ্ড-তপস্বী। রান্নাঘরের বারান্দার কোণে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া চতুষ্পদ বিড়াল কিসের ধ্যান করে, তাকি তোমরা জান না? না, কর্ত্তার জল-খাবারের ঘরে গিয়া সন্ধ্যার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিসের আহ্নিক করেন, তাহা তোমরা বুঝ না? তোমরা জানও সব, বুঝও

সব,—কেবল জাতীয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই না, দ্বিপদে ও চতুষ্পদে প্রভেদ করে। বাস্তবিক পাল-চক্রবর্ত্তীর সহিত পুষি-মেনীর কোন প্রকৃতি-গত প্রভেদ আছে কি ?

এইরূপ ছাগ, মেষ, শুন, গব প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ-পালিত পশুজাতীয় মানব বঙ্গদেশে যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূতিগন্ধময় পঙ্ক-পল্বল-প্রিয় পুরুষ-শূকরেরও অভাব নাই ; নীলী ভাণ্ডে পতিত পুরুষ-শৃগালও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। এমন বিচিত্র, বিস্তীর্ণ চিঁড়িয়াখানায় দুই একটি সিংহ-শার্দ্দূলও আছে।

তত্র সর্প-ধর্ম্মী

সর্প-স্বভাব মানবেরও অভাব নাই। একহারা, লিক্‌লিকে, ছিপ্‌-ছিপে চেহারা ; সে শরীর যেন কিছুতেই ভাঙ্গেও না, মচ্‌কায়ও না। গায়ের চামড়া—পাত্‌লা, চিক্কণ ও মসৃণ,—অথচ চাকা চাকা দাদে ভরা ; হাতের পায়ের নলি সরু সরু ; আঁৎ কখন ভরা থাকে না,—চিরদিনই পাত্‌খোলার মত পড়িয়াই আছে ; চলিবে আঁকা বাঁকা ; দাঁড়াইবে ঘাড় বাঁকাইয়া ; কথা কহিবে অতি ক্ষীণস্বরে ; হাসিবে—এক দিকে, এক পাশে, একটু খানি ; আর যখন চাহিবে—তাহার সেই চাহনিতেই তাহার খল-স্বভাবের পূর্ণ প্রতিমা প্রতিভাত হইবে। সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, বক্রগতি বিষ-বিদ্যুতের চাহনিতেই বুঝা যায়, সে তাহার অন্তরের অন্তর হইতে কণামাত্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তোমার অন্তরে অমৃত, গরল,—যাহাই থাকুক, সে সেই বিষ তোমার অন্তরে ইঞ্জেক্ট করিয়া তোমার পরীক্ষা করিবে। তুমি সংসারের নূতন ব্রতী,—সেই বিষে তোমার শিরা সকল সড়্‌ সড়্‌ করিবে, মাথায় মৃদু ঝিম্‌কিনি

আসিবে; সেই বিষ-চক্ষু তোমার অমৃতময় বলিয়া বোধ হইবে, খলের পিরীতি তখন তোমার কাছে সরলের প্রণয় বলিয়া মনে হইবে। আর তুমি সংসারের ঘাগী, সাত হাটের কানাকড়ি—সর্প-ধর্ম্মী মানবের ঐরূপ বিষ-পিচকারী তোমার উপর কত বার হইয়াছে; তুমি ভুক্তভোগী: সেই পরিচিত দৃষ্টিতে তুমি মনে মনে হাসিবে, মনে মনে বলিবে, "দাদা, উহাতে আর আমাদের কিছু হয় না, বহু দিন হইল আমরা উহার কাটান্ ঔষধ (antidote) খাইয়া আপ্তসার করিয়া রাখিয়াছি।

খল-স্বভাব মানব কখন রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতে পারে না—ঐ অলিতে গলিতে, আপে পাশে, অনাচে কানাচে। সন্ধ্যার পর ইঁহাদের সখের বিহার ও সুখের বিচরণ। বিষ-বায়ু-ভক্ষণেই ইঁহাদের শরীরের পুর্ত্তি এবং হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। যেখানে কুৎসা, নিন্দা, কলহ, দ্বেষাদ্বেষী, রীষারীষি,—সেই খানেই বিষ-জীবন কোণে বসিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। কিন্তু এক স্থানে কখনই দুই দণ্ড স্থির থাকিতে পারিবে না। সুড়ি সুড়ি, গুড়ি গুড়ি আসিবে, আর একটু পরেই তেমনই সুড়ি সুড়ি অলক্ষিত ভাবে চলিয়া যাইবে। পথে হাওয়া খাওয়া—তাও তদ্রূপ। পথের ধারে ধারে, প্রাচীরের পাশে পাশে চলিবে। কোথাও গান-বাজনা হইতেছে, সেইখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, একবার জানালা দিয়া উঁকি মারিবে, একবার গায়কের প্রতি সেই তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে; সভাস্থ কাহারও সহিত চোখে চোখে হইলে অমনই "Good evening, Babu!" বলিয়া সরিয়া পড়িবে। খল কখন মজলিসী হয় না। আবার কোথাও দীনদুঃখী দিনান্তে দু'টি অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছে, সেই সময়ে সর্প-ধর্ম্মী গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "দুখীরাম, তোমার বড় মেয়ে মরেছে—সে

আজ কত দিন হে?” প্রশ্নকারীর উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু দুখীরামের অর্দ্ধ অন্ন উদরস্থ হইল না। খলের চরিত্র এইরূপ।

বলিহারি, বাইবেলের কবিকে! সয়তানকে সর্প-ধর্ম্মী করিয়া সংসারের কি গুহ্য কথাই কবিত্বে প্রকাশ করিয়াছেন! খলই সয়তান। চোর, লম্পট, মিথ্যুক, ঘাতুক,—সংসারে শত বিধ পাপী আছে, কিন্তু খলকে পাপী বলিলে হয় না,—মহাপাপী বলিলেও কুলায় না। খল—সয়তান। যে পাপ করে, সেই পাপী; আর যে নিজে পাপ, তাহাকে কি পাপী বলিলে বুঝা যায়?—সে সয়তান। তোমার ভাল দেখিয়া খল ব্যক্তি যে, সকল সময়েই তোমার মন্দ করিবে, এমন কথা নাই; কিছুই করিবে না; পাপের বাহ্য কার্য্য কিছুই করিবে না; কিন্তু সে নিজে আপনাকে আপনি পাপে পরিণত করিবে,—পাপের দহনে আপনি দগ্ধ হইতে থাকিবে; খলের জীবনই এইরূপ।

বাইবেলের কবির বর্ণনা এইরূপ যে, সয়তান বিশ্ববিধাতার বিরোধী। সে আভা সহিতে পারে না, শোভা দেখিতে পারে না, কোথাও সুখ দেখিলে তাহার কষ্ট হয়। কাজেই সয়তান এই অনন্ত অজস্র সুখ-প্রস্রবণ সংসারের বিধাতার বিরোধী। কিন্তু বিরোধী হইয়া কি করিবে? সে ত তাঁহার মহামহিমা স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং সয়তান স্রষ্টার উপর আক্রোশ করিয়া সৃষ্টির সার মানবের অধঃপতন সাধন করিল; তোমার চতুষ্পার্শ্বস্থ ছোটখাট' সয়তানেরা অদ্যাপি দেখ তাহাই করিতেছে। তোমার কিছু করিতে না পারিলেই, তোমার কৃতিত্ব নষ্ট করিতে ব্যগ্র।

বিধাতার এই বিচিত্র রহস্যময় সংসারে সর্প-ধর্ম্মীর সর্ব্বত্রই গতিবিধি। কোন্ স্থান দিয়া তোমার নন্দনকাননে সে আসা-যাওয়া করে, তাহার তুমি কিছুই জান না। তাহার পর তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীকে ভুলাইয়া

সে যখন তোমার সর্ব্বনাশ-সাধন করে, তখনই তোমার চমক হয় ও টনক্ নড়ে। তোমার অধঃপতনেই সর্প-ধর্ম্মীর অভিষ্টসিদ্ধি এবং পরম আহ্লাদ। এই যে রঙে কুট্‌কুটে, চেহারায় ছিপ্‌ছিপে, মেজাজে ভিজ্‌ভিজে মন্থরা দাসী সন্ধ্যার সময় তোমার গৃহে শয্যা করিতে গিয়া তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীর কাছে দাঁড়াইয়া ফিসি ফিসি প্রত্যহ কি কথা বলে,—উহাকে তুমি কখন বিশ্বাস করিও না। সর্প-ধর্ম্মিণীদের মত অমন ঘর-ভাঙ্গানী আর নাই। সোনার সংসার ছারখার করিয়াই উহাদের আনন্দ। যত শীঘ্র পার, তোমার নন্দনকানন হইতে ঐ সয়তান সর্পিণীকে দূর করিবে।

সর্প-ধর্ম্মীর ন্যায় গোধা, গিরগিটে, ইন্দুর, ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপ-ধর্ম্মী মানব আছে।

* * * *

তুমি নিজে যদি মানব-ধর্ম্মী মানব হও, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব চিঁড়িয়াখানা তোমার আনন্দের উপবন। উহার বৈচিত্র্যেই তোমার আনন্দ হইবে। টিয়াকে দুটি ছোলা, ময়নাকে একটু ছাতু, বুল্‌বুলিকে একটি তেলাকুচা, বিড়ালকে একখানি কাঁটা, কুক্কুরকে একটু হাড়, হরিণকে দুটি ঘাস দিতে পারিলেই আরও আনন্দ—আরও মজা। যথাসাধ্য সকলকেই পালন করিবে; ভবের চিঁড়িয়াখানায় অমন মজা আর কিছুতেই নাই; তবে বাইবেলের কবির উপদেশ কখন ভুলিও না,—দুধ দিয়া কখন কাল-সাপ পুষিও না। খলকে কখন প্রশ্রয় দিও না। সর্প-ধর্ম্মীর উপর অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া তুমি তাহাকে পদাঘাতে দূর করিও।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ [নবজীবন—২য় ভাগ

৩৪

শুক-সারী-সংবাদ

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজ্‌গারী ছেলে ;
সারী বলে, আমার রাধায় গহনা দিবে ব'লে,
—রোজ্‌গার কিসের লাগি ?

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চস্‌মা শোভে নাকে ;
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখ্‌বার পাকে,
—নৈলে প'র্‌বে কেন ?

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের দাড়ি দোলায়িত ;
সারী বলে, আমার রাধায় চিরুনী-চালিত,
—নৈলে জটা হ'ত।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চেন্ ঝল্‌মল্ ;
সারী বলে, সে ত রাধার গোটেরি নকল,
—কেবল এ-পিট ও-পিট।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের আল্‌বার্ট টেরি ;
সারী বলে, আমার রাধার সীঁথির অনুকারী,
—টেরি পেলে কোথা ?

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ (কভু) হ্যাট-কোট-ধারী ;
সারী বলে, রাধার তখন ঘেরাল' ঘাঘরী,
—সে যে রাই নাগরী।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সাম্য গীত গায় ;
সারী বলে, আমার রাধায় ভুলাবারে চায়,
—নৈলে বিষম দায়।

শুক বলে, কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা তরে ;
সারী বলে, তাইতে রাধার কোটালী সে করে.
—এই দিন দুপরে।

শুক বলে, কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার ;
সারী বলে, নৈলে মন পেতো কি রাধার ?
—হ'ত পায়ে ধরা সার।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কোম্‌ৎ-তন্ত্র * পড়ে ;
সারী বলে, আমার রাধার পূজা ক'র্‌বে ব'লে,
—কোম্‌ৎ রাধা-তন্ত্র।

* অগস্‌ৎ কোম্‌ৎ (Auguste Comte)-প্রবর্ত্তিত প্রামাণিক (Positive) ধর্ম্ম।

"The effective sex is naturally the most perfect representative of Humanity and at the same time her principal minister. Nor will art be able worthily to embody humanity except in the form of woman.........The symbol of our Divinity will always be a woman of the age of thirty, with her son in her arms."
—Catechism of Positive Religion. Pp 119 and 142.

১৫২ পৃষ্ঠার কোম্‌ৎ-সম্বন্ধে পাদটীকা দেখুন।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ হ'বে বলণ্টিয়ার ;
সারী বলে, আমার রাধা তা'তেও আগুসার,
—যমুনার ঢেউ দেখেছ !

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায় ;
সারী বলে, আমার রাধা মন্ত্রদাতা তায়,
—সে যে মন্ত্র-গুরু।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লেখে নভেল-নাটক ;
সারী বলে, তা'তে রাধার গুণেরই চটক,
—তাই পড়ে পাঠক।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন গায় ;
সারী বলে, বিনোদিনী মহাপ্রভু তায়,
—নৈলে ভজ্‌বে কেন ?

কবি বলে, শুক-সারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা,
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা ;
—বলি, লাগ্‌লো কেমন ?

শ্রাবণ, ১২৯২] [নবজীবন—২য় ভাগ

৩৫

আবু

জলতলে একটি মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হইলে সমকেন্দ্রী বীচিচক্র খেলিতে থাকে। চক্রের পরিধি ক্রমেই আয়ত হয়, কিন্তু তরঙ্গ-বেগের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে,—দূরে ক্রমে মিশাইয়া যায়। কিন্তু প্রবাস-চিন্তা-বেগের ভিন্ন ধর্ম্ম,—পরিবারের মধ্যে থাকিলে যে সামান্য বিপদের অনুপাত একেবারে গ্রাহ্যই করিতাম না, প্রবাসে দেখ সেই অশুভ-সংবাদ-জনিত চিন্তার বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ করিয়াছে। বাস হইতে প্রবাস যত দূর হইবে, তোমার হৃদয়-কন্দরস্থ ভাবনাপিণ্ড ততই বেগ-তাড়িত প্রতি-তাড়িত হইয়া দুলিতে, চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ডুবিতে, ভাসিতে থাকিবে। আবার আকর্ষণী শক্তিবলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও, ভালবাসার কেন্দ্রের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, তরঙ্গের বেগ ততই বাড়িতে থাকিবে।

প্রবাসে এক দিন এইরূপ দুর্ভাবনায় আলোড়িত হইতে ছিলাম। চাঞ্চল্য-নিবারণ-জন্য, হে কাগজাবতার তাস! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম। তুমি নানারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত করিয়া আমার মনকে ভুলাইয়াছিলে। মন তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তান্ত্রিক পূজার জন্য মানসিক উপকরণ আহরণ করিতেছিল। কখন বা ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, রাশি রাশি গন্ধপুষ্প উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত ছিল; কখন বা মনোমোহিনী প্রতিমা-সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপমালা জ্বালনে অভিনিবিষ্ট ছিল; কখন বা

বলিদান-অবসানে মন সন্তোনিঃসৃত শোণিত-পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণে ঘোর-রোল-সমুত্থানকারী ঢক্কারবে প্রোৎসাহিত হইয়া সমারোহ-মধ্যে ভয়ানক ভাবে নৃত্য করিতেছিল ; কখন বা নিরঞ্জনান্তে আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণঘট মস্তকে ধারণ করিয়া আবার কবে ষষ্ঠী-সপ্তমী আসিবে ভাবিতে ভাবিতে মন মনে মনে ক্রন্দন করিতেছিল। হে কাগজাবতার! দ্বিপঞ্চাশদবয়বী তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তান্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিরত করিয়াছিলে। তুমি ধন্য! তুমি আমার যথার্থ উপকার করিয়াছিলে ; আমি তোমার সেই উপকার স্বীকার-জন্য আজ মুক্ত কলমে তোমার মহিমা বর্ণন করিব।

হে সুদৃশ্য-সুচিত্র-চারু-চৌকোণ-রূপধারিন্! তুমি আমাকে যে মনঃ-পূজা হইতে বিরত করিয়াছিলে, তাহারই কৃতজ্ঞতা-স্বীকার-জন্য আমি তোমার গুণগান করিব। আমি সামান্য পৌত্তলিকদের ন্যায় ফল-মূল-বিল্বদল, 'এতে গন্ধপুষ্পে' দিয়া তোমার পূজা করি নাই। আমি মূঢ় পৌত্তলিক নহি, আমি পরম জ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর তোমার মহিমা ধ্যান করিয়াছি। তোমার গূঢ় তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি কৃপালু— আমি তোমার প্রসাদে তোমার অগাধ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছি। তোমার জয় হউক। আমি তোমার মহিমা জগতে প্রকাশ করিব।—ইতি প্রস্তাবনা।

তাসখেলা এই জটিল সংসারের অতি সুন্দর অনুলিপি। প্রথম "খেলা"—

খেলা এই সংসার-লীলা। অনেকে বলেন যে, চতুরঙ্গক্রীড়া অতি উত্তম, কেন না প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজনে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্ররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল ; যাহার বুদ্ধি, বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই জয়লাভ করিবে। এটি সত্য হউক, মিথ্যা হউক—ঘোর অনৈসর্গিক।

কাথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্ম্মস্থানে হউক, বলাস-ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক—কোথায় দেখিয়াছেন যে, দুই জন সমান উপকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হইল? কোন্ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে, দুই জন যোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়াছে? জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জন সমযোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না: তা পায় না। বৈষম্যই জগতের নিয়ম, সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। তবে কেন খেলিবার সময় আমরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃততা শিক্ষা-লাভে আমরা যত্নবান্ হইব? চতুরঙ্গক্রীড়া আমাদিগকে অতি ভুল শিক্ষা প্রদান করে। তাসখেলায় তাসের বৈষম্য-সংস্থাপনই নিয়ম, সুতরাং তাসের এটি একটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গের ক্রীড়ক-সংখ্যা ও ক্রীড়া-পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত বা সাথী না থাকিলে চলে না, খেলাতেও মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার? যার নাই, তার আর খেলা কি? সে কিসের সংসারী? তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহারা তোমার মাত নহে; তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সর্ব্বদাই আছেন,—তোমার স্বার্থে তাঁহার স্বার্থ, কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে—হিন্দু-সংসারে পতির যে একমাত্র সহায়—দুখের দুখী, সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, আহ্লাদে আহ্লাদিনী, বিষাদে অবসন্না—সেই সঙ্গিনী, সংসার খেলার সেই মাত,—কখনই তোমার নিকট কুটুম্বিনী হইতে, তোমার নিজ গোত্র হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে না। দূর বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাসক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয়; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য-সমাজের গাঁথনই এই রূপ। যদি তুমি সৌভ্রাত্রসুখ আস্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছাপূর্ব্বক কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার রোগ-শান্তির জন্য কিছু দিন রাত্রিজাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্ট ভোগ কর। যদি প্রণয়িনীর প্রণয় প্রার্থনা কর, তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়-পচনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাইবে না; মানব-সমাজ তোমার জন্য নহে। সুখ-দুঃখ-বিনিময়ই এ বিপণীর ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।

চতুরঙ্গক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্য ও সাজান'। তাসখেলায় কাহার হস্তে কি আছে, কেহ জানে না, কেহ কোনরূপ নিয়মিত সাজান' উপকরণ পায় না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়াদিয়াছেন যে, আমি এই এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি? তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বোধ, তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হইতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া, কাহাকেও ভয় না করিয়া এক হাতেই, নিজ হাতেই ছক্কা করিতে পার,—তখন তোমার উপকরণ-ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং সে ত আরও তখন বিলক্ষণ স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে

হইবে। কিন্তু এক হাতে ছক্কা করা যায়—এমন তাস কয়জন কয়বার এ সংসারে পাইতে পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকে। পরচিত্ত অন্ধকার এবং ইহলোকে আমাদের পরচিত্ত লইয়াই ব্যবসায়, সুতরাং প্রধান উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে। যে গুপ্ত অনুমান করিতে পারে, সেই বিষয়ী; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি, না পারিলেই কি? তবে উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহা কিরূপে অনুমান করিবে? তাসখেলায় যাহা কর, সংসারে ত তাহাই কর; অথবা সংসারে যাহা করিতে হয়, তাসখেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির কি উপকরণ আছে জানিতে হইলে আমরা কি করি?—তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি—স্মরণ করিয়া অনুমান করি। তাসখেলাতেও তাহাই করি।—ইনি যখন দু'টা দশের উপর তুরুপ করিলেন না, তখন ইঁহার স্থানে নিশ্চয় তুরুপ নাই। ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন—আর-হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে, ইস্কাবনের টেক্কার পরেই দশ ছিল, তবে টেক্কা এঁর স্থানেই আছে; আমার মাতের হাতে ত নাই—থাকিলে তিনি এমন সময় গ্রাই ভেঙ্গে ও-রঙ্গ্ খেলিবেন কেন? আমার দক্ষিণ-দিকের দ্বন্দ্বীর স্থানেও নাই—থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তুরুপ করিবেন? তবে টেক্কাটা এঁর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি, ঠিক তাই করিলাম।

তাসখেলায় 'কাটান'ও সংসারের অনুলিপি। কাটান' সংসারে প্রবেশ বা জন্ম-পরিগ্রহ। এক জন্ম-পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে। জন্মই বলুন আর কাটান'ই বলুন—একেবারে সম্পূর্ণ

অদৃষ্ট-মূলক। আপনার জন্মের উপর কাহার হাত আছে? তুমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার জন্ম-ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম-বৈগুণ্যেই দেখ, ঐ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আঢ্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উদরপূর্ত্তি-জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না; আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে 'নীচ-নরাধম' উপাধি দিয়া সম্মানবৃদ্ধি করিতেন না। তাসখেলায় একজন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে সে কি নীচ-নরাধম? তা যদি না হয়, তবে যে চোর সে কি করিয়া হইল? জিজ্ঞাসা করিবে, তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তাহা কে বলিতেছে। তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে। তাসখেলায় যেমন বোকা আছে—সংসারে তাহা অপেক্ষা অধিক বোকা আছে। তবে যে পেটের দায়ে নীচ, তাহাকে যে নীচ বলে—সে আরও নীচ!

কাটান' যদি জন্ম-পরিগ্রহ হইল, তাহ'লে এখন তুরুপ কি তা বোঝা গেল।—জাতিগত বৈলক্ষণ্য-জনিত প্রাধান্যই তুরুপ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তুরুপ, এখন ইংরাজই তুরুপ! কোথাও অসভ্য জনগণ-মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তুরুপ, আবার কোথাও বৈশ্য তুরুপ। প্রাচীন কালে ড্রুইড, পোপ, পাদ্রি, সাগ্নিক পারসী ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানাস্থানে ধর্ম্ম-তুরুপ ছিলেন, এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন-তুরুপ এবং বোধ হয় কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে।

*

ধনীরাই রঙ্, আর সকলেই বদ্‌রঙ্! ধনীর জন্ম-পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান' কি তা জানা গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধন কে, তাও জানা গেল—বদ্‌রঙ্ কি তা বোঝা গেল।

চারি রঙ্গ কি তাহা কিন্তু কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে সমাজের যে চারি ভাগ ছিল, ইহা তাহাই মাত্র। যে ইস্কাবন সে ইস্কাবনই আছে, তবে কাটান'র জন্যই ইস্কাবনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী। যে শূদ্র সে নামে এখনও শূদ্রই আছে, কেবল জন্মগুণে সে দেখ উচ্চ গদীর উপর আসীন। সে এখন তুরুপ বলিয়াই ঐ দেখ, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর অভিজিৎ ছত্তন ও বালমুকুন্দ দর্‌বৎ তাহার দুয়ারের দুয়ারী। সে এখন তুরুপ হইয়াছে বলিয়াই বেগের গাঙ্গুলী হরিরামের সন্তান ঐ পাঁচকড়ি গোমস্তা নীচে মসীপূর্ণ ছিন্ন শপে বসিয়া বাবুর 'গোলাল'গালাল' কাল'কোল' হাসুলিপদক-পরান' ছেলেটিকে কোলে করিতেছে। এখন তুরুপ হইয়াছে বলিয়াই ইস্কাবনের সাত্তা হরতনের টেক্কার উপর চইল কি না? এখনও এই সমাজের খেলার কথা ভাবি যে, এ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? উভয়ই মনুষ্য করিয়াছে। যখন গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছ, তখন তুরুপের বল মানিতেই হইবে। তুরুপ বেশি না পাও বিরক্ত হইও না, যাহা পাইয়াছ তাহাতেই খেলিতে হইবে। খেলাতে কোন ভুলচুক না হইলেই হইল। আর খেলিতে না চাও, তা হ'লে ত কথাই নাই। আর যদি এবার বেশি তুরুপ পাইয়া থাক, তা হ'লে একেবারে গর্ব্বিত হইও না,—হয় ত সাততুরুপ হইলেও হইতে পারে। এ হাত এই হইল, আর হাত কি হইবে তার স্থির কি আছে? ছক্কা-পঞ্জা রেখে খেলা ভেঙ্গে উঠে যেতে পার, তবেই ভাল; কিন্তু মনে থাকে যেন, তোমার চারখানা কাগজ ও এক ছক্কা এক হাতে উঠিতে পারে। অতএব ধনি! তাসখেলা মনে ক'রে একটু সাম্য অবলম্বন কর।

সাত-তুরুপে আট-তুরুপে খেলে না কেন?

এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সমতা রাখিবার চেষ্টামাত্র। বাহ্য দর্শনে সকলেই দুই পদ, দুই হস্ত, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ লইয়া জগৎ-খেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জন্ম-বৈলক্ষণ্যে একব্যক্তি প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষগত ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও নির্ধন—আর অপর ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান্, ইহাকেই পূর্ব্ব অদৃষ্টের ফলাফল বলিতেছিলাম। আমরা যোলখানা পাইয়াছি, তোমরাও ষোলখানা পাইয়াছ, কিন্তু আমার ষোলখানা এমন কাগজ যে, তাহার প্রত্যেক খানায় যে বল ধারণ করে, তাহা তোমার সকলগুলিতে একত্র নাই। তাসদেব একটু দয়া করিয়া নির্ধনের দিকে একটু মুখতুলে চাহিয়াছিলেন। যদি ধনী তুমি নির্ধনের সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস-বিধাতা বলিতেছেন, 'আমি এই নিয়ম করিলাম যে, তুমি সমস্ত ধন (তুরুপ) নিজে লইও না, অথবা তাহার সপ্তগুণক পরিমিত ধন লইও না।—এত বৈষম্য আমরা দেখিতে পারিব না।' তাস-বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। সমাজবিধাতৃগণ, শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি সকল সময় এইরূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কতক মঙ্গল হয়; অনেক সময় তাঁহারা তাহা করেন না। অনেক সময় সাততুরুপে ও একতুরুপে খেলিতে বসাইয়া খেলা দেখিতে থাকেন। হে ফলকাবতার! তাঁহারা তোমার অবমাননা করেন। তুমি প্রেমারা মূর্ত্তিতে তাঁহাদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ কর, আমার প্রার্থনা পূরণ কর। তোমার মঙ্গল হউক!

সকলেই শুনিয়া থাকিবেন যে, সাততুরুপের পর পড়্তা ফিরিয়া যায়। তাসখেলায় তাহা নিত্য হয় কি না, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সামান্য ব্যক্তিগণ-মধ্যে বা খণ্ড-সমাজে প্রায়ই হয় না।—কেন না, শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময় সাততুরুপের আইন মানিয়া চলেন না, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এরূপ সাততুরুপ মধ্যে মধ্যেই হইয়া থাকে ও পড়্তাও

ফিরিয়া যায়। পুরাকালের দৃষ্টান্তে, পুরাণ' কথায় কাজ কি? তাহাতে শ্রদ্ধাই বা কে করিবে? আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাততুরুপের অথবা আটতুরুপের প্রধান দৃষ্টান্ত ফরাশিস্ বিপর্য্যয়। এটি আটতুরুপ—হাতের কাগজ পর্য্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের দেশত্যাগ ও আমেরিকায় নূতন পড়্‌তা লইয়া খেলা আরম্ভ করা। তৃতীয় সাততুরুপে মহাজন-পীড়িত সাঁওতালগণের রাজবিদ্রোহ। চতুর্থ স্পেনে রাজবিপ্লব, পঞ্চম এখন চলিতেছে ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবিগণের strike অর্থাৎ একমতে অধিক বৃত্তি প্রার্থনা করা। তাহারা এত দিন সাততুরুপে খেলিতেছিল, হারিতেও ছিল, আর তাহারা তুরুপ না পাইলে কিছুতেই খেলিতে চায় না। হে লাল-কাল-ফোঁটা-সমন্বিত-পঞ্জা-পতাকা-চিহ্ন-ধারিন্! তুমিই তাহাদের মনে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমাকে সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চারি রঙ্ সমাজের পূর্ব্বকালিক চারিটি ভাগমাত্র! কোন্ রঙ্‌টি কোন্ ভাগ ছিল? উত্তর—হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, চিড়িতন—এই চারি রঙ্। ইহাদিগকে ইংরাজিতে Heart বা হৃদয়, Diamond বা হীরক, Spade বা কৃষিযন্ত্র ও Club or Dagger অথবা যুদ্ধাস্ত্র কহে। ভারতবর্ষের জনগণের এখন যেরূপ ভাগ, এও ঠিক তাই। এখনকার ভাগ ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লইয়া নহে। এখন শূদ্রেরা একটু উন্নত পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে,—তাহারা ক্রীতদাস নহে। কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে এখন কেহই নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।—কতক কৃষিজীবী, তাহারা শূদ্রভাবাপন্ন; কতক

কুসীদজীবী বা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি, রাওজি; পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া; আর্য্যাবর্ত্তে আগর্ওয়ালা বা মার্ওয়ারি বা কাঁইয়া এবং বঙ্গে বণিক্। তাসের ভাগ দেখুন।—যে পরের হৃদয়ের উপর, বিশ্বাসের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে কি? সে ধর্ম্মযাজক বা ব্রাহ্মণ—তিনি হরতন। যে হীরা-মণি-মুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে, সে কি? সে জহুরী বা বণিক্, বৈশ্য বা ধনী—তিনি রুইতন। কৃষিযন্ত্রই যার জীবনের একমাত্র উপায় বা চিহ্ন, সে কৃষী; শূদ্রই বলুন বা বৈশ্যই বলুন—তিনি ইস্কাবন। আর গদা বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন, তা কে না জানে? সুতরাং তাসের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিরূপ মাত্র।

চারি রঙ্ যদি এইরূপই হইল, তবে সাত্তা, আট্টা এ সব কি? **সাত্তা হইতে টেক্কা** একটি হিন্দু-পরিবারের প্রতিকৃতি। কিন্তু কোন্‌টি কি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সংসারে আমরা প্রাধান্য-স্বীকার দুই ভাবে করিয়া থাকি। একজন প্রভুত্ব করে, আমরা সেই প্রভুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই বলিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করি। আর কতকগুলি লোককে আমরা মান্য-মর্য্যাদা, সম্ভ্রম-গৌরব, আদর ইত্যাদি স্বতঃই প্রদান করিয়া থাকি। তাস খেলাতেও এইরূপ দুই প্রকার প্রাধান্য গণনা আছে। এক **ফোঁটা গণনা**, আর এক উপর্য্যুপরি গণনা। দওলা তিনখানা তাসের পর বটে, কিন্তু ইহার মর্য্যাদা বিস্তর। মর্য্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত'—কেবল টেক্কার নীচে মাত্র। সাহেব গণনায় টেক্কার নীচে বটে, কিন্তু তেমন আদর নাই—ফোঁটা গণনায় তিন ফোঁটা মাত্র। কেন এমন হয়, তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি যে, সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু-পরিবারের

প্রতিকৃতি। সাত্তা হইতে টেকার ক্রমে বয়-আধিক্য-জনিতই একের উপর অন্তের সংস্থান বুঝিতে হইবে।

সাত্তা অবিবাহিতা কন্তা।

আত্তা তাই, তবে ব্যয়-আধিক্যবশতঃ সাত্তার উপর বটে। হিন্দু-পরিবার-মধ্যে ইহাদিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া নারীজাতির উপর আমাদিগের সাম্য-দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদান করেন। বচনের প্রথম ভাগটি এই—"কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"—কন্তাকেও পালন করিবে, অতি যত্নে শিক্ষা দিবে। শাস্ত্রের অবমাননা হয়, এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত হইতেছে না। তবে শাস্ত্রের বচনোদ্ধৃতকারকদিগের দোষ শাস্ত্রকে শিরে ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মে পতিত না হই, এমন করিয়া বলিতে হইবে। শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণের তুলনা করিলে আর অবমাননা কি হইল? বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মত্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাটীতে কখন শূদ্র-ভোজন দেখিয়াছেন? মনে করুন, গৃহস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দালানে দণ্ডায়মান,—শ্রীবিষ্ণু, দালানের থামে হেলান্ দিয়া বসিয়া আছেন। ভৃত্যে তাঁহাকে পাখা করিতেছে; বেলা সার্দ্ধ-তৃতীয় প্রহর। পল্লীর নবশাখগণ নূতন-ঘাসছোলা, তিনবার-গোবর-দেওয়া প্রাঙ্গণে উঁচু হইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর। বাঁড়ুয্যে মহাশয় পরিবেশকদিগকে বলিলেন, "ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।" এই হইল—"কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" সুতরাং সাত্তা-আট্টার কি ক্ষমতা থাকিবে?

ন্ওলা—অবিবাহিত বালক, অবশ্য অনুজা ভগিনীদিগের উপর ইহার প্রভুত্ব আছে। আর যখন বড়-মানুষের ছেলে অর্থাৎ তুরুপ হয়, তখন তাহার কথা পরে বলিব।

দওলা—নবোঢ়া বধূ, বাড়ীর ক'নে বৌ। এঁর গৌরব কেবল দ্বিতীয় গণিত'। আহা! বঙ্গ-পরিবার-মধ্যে নবোঢ়া বধূর আদর দেখিলে কাহার না ক'নে হ'তে ইচ্ছা হয়? বৌমা সর্ব্বদা অলঙ্কারে ভূষিতা, ভাল-সাটী-পরিহিতা, ধনিগৃহে দাসী-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিতা, কাঙ্গালীর গৃহে নিভৃত দেশে গুণ্ঠনাবৃতাস্থিতা। মনুষ্যের যে অবস্থাই হউক না কেন, বৌয়ের আদর কত! পুতের বৌ তিনি কোলে কোলে ফিরিতেছেন। যদি কর্ত্তার ভোজন হইল, তবে এখন বৌমার খাবার কি? বৌকে খাওয়ালে, বৌকে শোয়ালে শাশুড়ীর—পরিবারের কতই আনন্দ।—"বাছা পরের মেয়েকে আপনার করিতে হইবে।" আহা বঙ্গাঙ্গনাগণ! কেন তোমরা চিরকালই বৌ থাক না? আহা দওলার গৌরব কত গৌরব!

গোলাম—প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। গোলামকে ইংরাজিতে slave এবং knave উভয় উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। Slave শব্দে গোলাম, knave শব্দে পাজি, সেই জন্য গোলামের আর একটি নাম পাজিও বলা যাইতে পারে; কোন কোন স্থলে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধূর্ত্ততা গণনা করিয়া ইহার স্থানাবধারণ হইয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে। এক্ষণে সাধারণতঃ গোলাম পুরুষ বলিয়া গৌরবে এক ফোঁটা মাত্র, জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি তাসের উপর। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণ নাই, তবে পেজোমি-পূর্ণ। সে গুণের কি ফল ফলে, পরে দেখিবেন।

বিবি—প্রৌঢ়া বঙ্গ-মহিলা, বাড়ীর বড় বৌ। যখন ক'নে বৌ, তখন ইঁহার গৌরব দশ ফোঁটা ছিল, এখন দুই ফোঁটা মাত্র। বাড়ীর গৃহিণী—বয়সে তৃতীয়া; তিনি সর্ব্বদাই বঙ্গ-সংসার লইয়া ব্যস্ত, কে তাঁহাকে আদর করিবে? তা'র সময়ে আহার হয় না, রাত্রিতে শোবার

অবকাশ নাই, দিবসে কথার অবকাশ নাই। কর্ত্রী বটেন, কিন্তু দাসী। যাহাকে সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইল, তাহাকে সকলের দাসী বৈ আর কি বলিব? তবে তিনি ধনশালীর বনিতা হইলে কখন কখন তাঁহার কিছু বিশেষ গৌরব হয়,—কিন্তু সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ-মহিলা, কর্ত্রী; গৌরবে কেবল পাজি হইতে অর্থাৎ গোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক।

সাহেব—বঙ্গীয় কৃতী পুরুষ, তাহাতেই ইঁহার নাম সাহেব। সাহেবেরাই কৃতী। ইনি কর্ত্রীর অগ্রে ভোজন করিতে পান, কিন্তু ক'নে বৌ দওলার পরে।—'এই যে, বৌমাকে খাওয়াইয়া আসিয়া তোমাকে ভাত দি।' সাহেব ছয় তাসের উপর, কিন্তু গণনে তিন কোঁটা।

টেক্কা—বাড়ীর কর্ত্তা। সাধারণতঃ ইঁহার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব সকলই অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি আদরে ক'নে বৌকেও ইঁহার পরে গণনা করিতে হয়। প্রভুত্বে কৃতী সাহেবকেও ইঁহার অধীনে থাকিতে হয়। ইনি টেক্কা, ইঁহার চিহ্ন এক। কর্ত্তা কি একজন ভিন্ন দুইজন হয়? গণনায় ইনি একাদশ,—এক পাজির এগার গুণ।

তবে তরুপের সময় এমন বিপর্য্যস্ত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। সে হইতেছে নাকি ধনীদের কথা—সাধারণ নিয়ম হইতে একটু বিপর্য্যস্ত হইবে বৈ কি। যে ধনী অথচ পাজি, পৃথিবীতে সেই বড় লোক। সে রঙ্গের গোলাম। সেই কর্ত্তা, সেই কৃতী—অথচ পাজি বলিয়া সে কৃতী হইতে কত গুণ, কর্ত্তা হইতে কত গুণ অধিক। গোলাম গৌরবে টেক্কার প্রায় দ্বিগুণ, প্রভুত্বে কর্ত্তার উপরিস্থিত। অমুক মুখুয্যে বড়-লোক। কেন জান? তিনি ধনী আর পাজি। তাঁর মত

ধনীও বিস্তর আছে, পাজিও বিস্তর আছে, কিন্তু তাঁর এত প্রশংসা কিসে? না, তিনি ধনী পাজি—রঙ্গের গোলাম। বাপ্ রে! তাহাতেই রঙ্গের নওলা দ্বিতীয় তাস। বড়-মানুষের ছেলে, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, কাজেই উদ্ধতস্বভাব, প্রভূতবিক্রমশালী ও সমধিক গৌরবান্বিত। গৌরবেও দ্বিতীয়, প্রভুত্বেও দ্বিতীয়। বায়রন ছেলেবেলায় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম-পত্রে লিখিত ছিল, "এই কাব্য লর্ড বায়রন নামক কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বিরচিত।" সমালোচক ক্রম সাহেব এই কথার উপর নানা উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? নাবালগের লেখা ব'লে? না লর্ডের লেখা ব'লে? না নাবালগ-লর্ডের লেখা ব'লে? আমরা উত্তর দিতেছি —নাবালগ-লর্ডের লেখা ব'লে,—একজন নওলা-শ্রেণীর লোকের লেখা ব'লে। সংসারে সকলেই যাহা করে, বায়রনের গ্রন্থ-প্রকাশক তাহাই করিয়াছিলেন মাত্র—ক্রমের এতটা উপহাস করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা তাসভক্ত লোক, নওলার নিন্দা আমাদের সহ্য হইবে কেন? ঐ যে অমুক কুমার বড় ঘোঁড়সওয়ার হইয়াছেন—ইহার অর্থ কি? অর্থ যে, তিনি বড়-মানুষের ছেলে, ঘোঁড়ায় চড়েন—আর দুঃখারি লোককে চাবুক মারেন, কেন না তিনি বড়-মানুষের ছেলে সুতরাং উদ্ধতস্বভাবান্বিত। তিনি একজন নওলা। ছোট বাবুর আদরের কথা সকলেই জানে। ছোট বাবুর দৌরাত্ম্য, উপদ্রব সকলি অধিক, সুতরাং নওলা গৌরবে ও প্রভুত্বে কেবল পাজি গোলামের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্র।

এক্ষণে তাসখেলায় আরও একটি অতি সুমহৎ উপদেশ পাওয়া যায়। তাসখেলায় বিন্তি আছে, পাঞ্জাশ আছে, শ আছে ও

ইস্তক্ক আছে। তিনখানা তাস একত্র হইলে এক কুড়ির কার্য্য করে, পাঁচখানা একত্র হইলে একবারকার খেলায় জয় হয় ও খেলা শেষ হয়। তোমরা দুই কোটি প্রজায় আর্ত্তনাদ করিলে কি রাজার এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইবে না? তা কখনই নয়। একতাই উন্নতির মূল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি। একজন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার নওলা ও দুইজন বঙ্গ-কুমারী সাত্তা আট্টা একত্র মিলিত হইলে কর্ত্তা, কর্ত্রী ও কৃতীর সহিত তুল্য বল ধারণ করে। একতা এইরূপ পদার্থই বটে। যে তিন তাসের কিছুমাত্র গৌরব নাই, একত্র হইয়াছে বলিয়া তাহারা এখন গৌরবে প্রধান তিন তাসের সমকক্ষ হইল। বঙ্গবাসিগণ, তাস খেলিবার সময় যখন বিস্তি বলিয়া ডাকিবে, তখন একবার তোমায় ভ্রাতার সহিত যে মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিও। যদি গোঁড়া হিন্দু হও, তবে একবার আধুনিক নব্য সম্প্রদায়কে—নব্য বলিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া, কৃশ্চান বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া—অভক্ষ্যভোজী জানিয়া যে আধুনিক হিন্দুয়ানির সারময়ী ঘৃণা প্রদর্শন কর, তাহা একবার স্মরণ করিও। নব্য ভ্রাতৃগণ! আপনারাও একবার বিদ্যাবত্তার সারতত্ত্বভূত যে অপূর্ব্ব বিদ্বেষ ভাবটি বুড়ো বোকা পৌত্তলিকদের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা একবার স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই তাসাবতারের কার্য্য সিদ্ধি, আর আমি এই অবতারের অদ্বৈতপ্রভু—অভিষেক-কর্ত্তা যোহন, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধি হইবে।

ইস্তক্কও একতার গুণের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এবার দম্পতী-মিলন। ধনবান্ কৃতী যদি ধনশালিনী কর্ত্রীর সহিত একযোগ হন, তাহা হইলে সাধারণের তিন জনের মিলনের ন্যায় গৌরবান্বিত হইবেন, তাঁহাতে আর বৈচিত্র্য কি? সাধারণের দম্পতী-মিলনের

গৌরব কি? সে ত হ'তেই পারে। যাহাদের মধ্যে সচরাচর হয় না, তাহাদের মধ্যে হ'লেই না গৌরব? আমাদের যুগল-রূপ দেখিয়া কে তৃপ্ত হইবে? তবে দম্পতী-প্রণয়ের কথা? সমাজ, বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গসমাজ কবে দম্পতী-প্রণয়ের গৌরব করিয়াছে? সে তোমার ঘরের কথা। তুমি তাহাতে সুখী হও, আমরা সমাজ তাহার জন্য কিছুই করিতে পারি না। তবে বড়-মানুষের স্ত্রীপুরুষের মিল—হাঁ, গৌরব করা উচিত বটে; ইহাকে এক কুড়ি দেওয়া গেল।

যেমন শ্রেণীবদ্ধ পাঁচ জনের মিলে এক শত হয়, তেমনি চারি বর্ণের একরূপ লোক একত্র হইলে, সেই 'শত' গৌরব পায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণের একধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্র হইলে যে গৌরবের কথা হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তবে চারিজন ক'নে বৌয়ে বা নবোঢ়া বধূতে একত্র হইয়া কি করিতে পারেন? তাঁহাদের আপনাদের যে চল্লিশ সংখ্যার গৌরব আছে, তাঁহারা যদি নিজ কুলে থাকিয়া যান, তবেই সে কুলের গৌরবের বৃদ্ধি করিলেন; নতুবা তোমার কুল ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছে, খেলার শেষ গণনায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরই গৌরব বাড়িল।

সেইরূপ চারিজন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালক বা বালিকা একত্র হইয়া কি করিতে পারে? এইজন্য চারি সাত্তায়, চারি আট্টায়, চারি নওলায়, চারি দশে শ হয় না।

হাতের পাঁচ। কোন সংগ্রামে যে পক্ষ শেষ যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার কিছু অতিরিক্ত গৌরব করিতেই হয়। শেষ জয়ের সুখ্যাতির নামই হাতের পাঁচ। কিন্তু যেমন খেলায় নির্ব্বোধ আছে, তেমনি সংসারে তদপেক্ষাও নির্ব্বোধ আছে। সংসারে কৃপণ লোক, দেখিতে

পাওয়া যায়, কেবল হাতের পাঁচ রাখিবার জন্যই যাবজ্জীবন ব্যস্ত, কিন্তু হাতের পাঁচ রাখিলেন, অথচ গণিয়া দেখেন যে, দুকুড়ি-সাত নাই। আগে খেলা রাখ, তারপর হাতের পাঁচের চেষ্টা কর; তা না হইলে তুমি বড় নির্ব্বোধ।

যে হাতের পাঁচ রাখিয়াছে, শেষ-রক্ষা করিয়াছে, অথচ খেলা আছে, সে পর হাতে কাগজ ভাসিবে। শেষ যুদ্ধে আমি জয়ী,—এক্ষণে আমি যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছি, তোমাকে আসিয়া সেইখানে লড়াই দিতে হইবে। গত বৎসর তোমায় আমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্‌বার করিয়া চৈত্র মাসের শেষে তোমার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে বৈশাখের প্রথমে তোমার দর লইয়াই আমাকে কার্‌বার করিতে হইতেছে; অর্থাৎ তোমার হাতের পাঁচ ছিল, তুমিই কাগজ দিলে। তুমি কাগজ দিয়াছ, তোমার কতকগুলি সুবিধা; এখন তোমায় আমায় যদ দুইজনে এক রকমের বিন্তি-পঞ্চাশ ডাকি, তাহা হইলে আমার গৌরব অধিক হইবে। বাস্তবিক মধ্যস্থ হইতে হইলে এইরূপ বিচার করাই উচিত।

আর দুকুড়িখানি কাগজের কথা বাকি আছে। এগুলি সামান্যতঃ গৌরবচিহ্ন মাত্র। যত দিন তুমি গৌরবের পাত্‌শাই পাঞ্জা উড়াতে না পারিলে, তত দিন তোমার গৌরব ঢাকা থাকাই বিধেয়; অর্থাৎ চারিখানা পর্য্যন্ত কাগজ উপুড় করিয়া ধরিও। সংসারের একটি রীতিই এই যে, তুমি চারিবার অনেক কষ্ট করিয়া যে খ্যাতিপত্তিটুকু সঞ্চয় করিলে, তোমার একবার খেলা না হওয়াতে তাহা তৎক্ষণাৎ হীন হইয়া গেল। তবে তুমি যদি একবার পাঞ্জা জাহির করিয়া থাক, তাহা হইলে পাঁচ হাত অন্ততঃ না গেলে তুমি আর একেবারে হীনগৌরব

হইবে না। পাঁচ হাত নহিলে পঞ্জা উঠে না। ছক্কা বড় বাড়, পঞ্জার উপর এক ফোঁটা। 'হুতোম' যাঁহাদিগকে সহরের হঠাৎ অবতার বলেন, তাঁহাদেরই চিহ্ন এই তাসের ছক্কা। তাঁহারা ভোগাইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিয়া যান। ধূমকেতুর ন্যায় গগন-পথে উদিত হইল, শিখায় গগনের একদেশ উজ্জ্বলীকৃত হইল, কত লোকের মনে কত অশুভ ভাবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। কিন্তু কত কাল যে স্থায়ী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যখন গেল, হঠাৎ চলিয়া গেল। এইজন্য ভাল খেলোয়াড়ে ছক্কা করিবার বড় আস্থা প্রদর্শন করে না। খেলা ত পঞ্জা, ছক্কা কেবল বৃথা জাঁকজমক মাত্র।

তাসখেলা যে সংসারের অবিকল প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক প্রকার দেখাইলাম। কিন্তু অতি গূঢ় কথা এখনও বলি নাই। সংসারের অতি গূঢ় বিদ্যা কি?—জুয়াচুরি। তিনি বড় পাকা লোক বলিলে কি বুঝায়?—যে তিনি একজন জুয়াচোর। তোমার হাতে কিছুমাত্র তাস নাই, কিন্তু তুমি এমনি মুখভঙ্গী করিতেছ যে, সকলেই মনে করিল তুমি একজন আঢ্য লোক। তুমি তাসে পাকা খেলোয়াড় হইলে,—সংসারে তুমি পাকা লোক হইলে। যখন 'খেলার গুরু কেন্‌নাই' আমরা বলি, তখন যেন মনে থাকে যে, তিনিই এই লোকযাত্রার গুরু। তবে তাসখেলার সময় আমরা স্বীকার করি, ভবের খেলাতে স্বীকার করাটা বড় প্রথা নয়।

সকল কথাই বলা হইল। এখন হে তাসদেব! তোমার বাওয়ান্নপীঠ মূর্তিতে একবার আবির্ভূত হও, হইয়া তোমার উনপঞ্চাশ মূর্তি আমার উনপঞ্চাশ অবয়বে ভর কর; আর তোমার প্রধান তিন মূর্তি আমার লেখনী, মসী ও কাগজে আশ্রয় কর—আমি একবার

"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"

সাত্তা-আট্টা কুমারীগণ! তোমাদের গৌরব কি এক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত?

নওলা ভাই! যদি তুরুপের হও ত মনে করিও যে বিপক্ষের গোলামে তোমাকে লইয়া যাইতে পারে।

দওলা ভগিনি! কুলে থাকিলেই কুলের গৌরব। কিন্তু বাঙ্গালায় যত দিন ক'নে থাকিবে, তত দিনই তোমাদের সুখের দিন; অতএব শীঘ্র ঘোমটা খুলিও না।

ওহে গোলাম! অদৃষ্টক্রমে এবার তুরুপের হয়েছ, মনে থাকে যেন বদ্‌রঙ্গের বেলা তোমার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা কম।

বিবি, সাহেব! কর্ত্রি ও কৃতি! তোমাদিগকে আমার আর কিছু বলিতে হইবে না; কিন্তু ধনি ও ধনশালিনি! ইস্তকটা কি, যেন মনে থাকে।

টেক্কা কর্ত্তামহাশয়! বদ্‌রঙ্গের সময় আপনাকে রঙ্গের সাত্তা দলন করে ব'লে আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না; ফিরে হাতে কি হয় দেখিবেন।

ভাই খেলোয়াড়গণ! তুরুপ পাইবার সময় যেন সাততুরুপ মনে থাকে, আঁরি হাতের পাঁচ রাখিতে গিয়া যেন খেলা খোয়াইও না। মহাপ্রভু তাস! যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুরু, কিন্তু তুমি ভবাবতার, তোমাকে নমস্কার করি।

আষাঢ়, ১২৭৯] [বঙ্গদর্শন—১ম খণ্ড

৩৬

নব বোধোদয়

অনেকেই আমাদের বারবার অনুযোগ করেন যে, আমরা যাহাতে স্ত্রীলোকের এবং বালকের বোধোদয় হয়, এমন সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত না করিয়া কেবল রাজনীতির কঠোর কূট লইয়া ব্যস্ত থাকি কেন? আমরা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারি নাই; পারি নাই বলিয়াই আজকাল বঙ্গমহিলার পাঠোপযোগী প্রবন্ধ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিয়া থাকি এবং অদ্য এই নব বোধোদয় বাল-জগতে প্রচারিত করিলাম।

অপদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত রাজা দেখিতে পাই, সে সমুদায়কে অপদার্থ কহে। অপদার্থ তিন প্রকার,—সচেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্। যে সকল রাজার অধিকার বা জায়গির আছে, তাহারা সচেতন অপদার্থ; যেমন রাজা অকর্ম্মন্ সিং, রাজা অসার-মগজ রাও, রাজা গণেশোদর দেব। যে সকল রাজার কোন বৃত্তি বা অধিকার নাই, কেবল উপাধিমাত্র আছে, তাহাদিগকে অচেতন অপদার্থ কহে; যেমন রাজশ্রী সঙ্গীতমোহন, রাজা কুলাঙ্গার মিত্র বাহাদুর, রাজা পদবী-জীবন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। যাহারা সচেতন, অচেতন—কোন প্রকারেরই অন্তর্গত নহে—ভুঁইফোড়

রাজা, তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ অপদার্থ কহে ; যেমন রাজা অকালকুষ্মাণ্ড, রাজা এরণ্ডক্রম, রাজা শৃগাল-কণ্টক রায় ইত্যাদি।

সমুদায় অপদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। এই জন্তুগণ মুখ ও নাসিকাদ্বারা আহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে মাত্র। এই পৃথিবীতে তাহাদের থাকিবার আর কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নাই, অথবা আমরা জানি না।

এই সকল জন্তুর প্রায় সকলেরই বাহ্যতঃ পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করিতে সকলে জানে না।

অনেক অপদার্থের চক্ষু আছে, ভাল-মন্দ দেখিতে পায় না ; কাহারও নাসিকা আছে, অথচ গন্ধ পায় না ; হস্ত আছে, কিন্তু স্বহস্তে কখন কাহাকেও কিছু দান করে নাই ; কর্ণ আছে, কিন্তু অনেকেই সদুপদেশ শুনিতে পায় না ; চরণ আছে, অথচ যানে, বাহনে, ঝাঁপানে না হইলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না।

দেখ, মনুষ্যেরা অপরাধীর এবং নিরপরাধীর দণ্ড বিধান করে, আপনার লোককে শত পুরস্কার প্রদান করে, জলে নৌকা চালায়, মাটিতে গাড়ী চালনা করে, আকাশে উড়িয়া যায়, কিন্তু অপদার্থকে কেহই জ্ঞান দান করিতে পারে না ; তাহা মনুষ্যের অসাধ্য।

পৃথিবীর সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এইরূপ নানা প্রকার অপদার্থ জন্তু আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর অর্থাৎ চতুষ্পদ। ইহাদিগকে মেষ বা বৃষ-রাশির রাজা বলা যায়। কতকগুলি জলচর ;—হস্ত-পদাদি থাকিলে কর্কট বা মকর-রাশি, না থাকিলে মীন-রাশি। আর কতকগুলি স্থল ও জল—উভয় স্থানে থাকে ; উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে। ইহারা কুম্ভ-রাশির লোক—উপরে মাটি, ভিতরে জল।

অপদার্থ রাজাদিগের মধ্যে উভচর চতুষ্পদই অধিক। তাহাদিগকে মাহষ-রাশির লোক বলে। এই জন্যই রাণীদের নাম "মহিষী"—অর্থাৎ উভচরী।

আবার কতকগুলি অপদার্থ জন্তু আছে, তাহারা পক্ষিজাতীয়; ইহারা বায়ু অপেক্ষাও লঘু। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ "পালক" ঢাকা। মধ্যে মধ্যে ডানা বাহির করিয়া ইহারা উড়িতে অভ্যাস করে। গোরা-মহলের ভারত-বাগ চিঁড়িয়াখানাতে এই রূপ পক্ষিজাতীয় অপদার্থ রাজা অনেক বিচরণ করিতেছে। কেহ কেহ চিত্রশালার অঙ্গন-মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পায়,—আপনার ইচ্ছামত পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়। কেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; তাহাদিগকে অধ্যক্ষ আহার যোগাইয়া থাকেন।

* * * *

অধিকাংশ অপদার্থ জন্তু লতাপাতা, ফলমূল, ঘাসের বীজ খাইয়া জীবন ধারণ করে। কতকগুলি আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল জন্তুর প্রাণ বধ করিয়া আপনার অপদার্থ জীবনের পোষণ করিয়া থাকে। উহাদিগকে শ্বাপদ অর্থাৎ শিকারী জন্তু বলে। দেবতারা বা উপদেবতারা কি অভিপ্রায়ে কোন্ রাজার অর্থাৎ অপদার্থ জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহার সবিশেষ অবগত নহি। এজন্য আমরা কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি ও স্পর্শ করি না। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বাস্তবিক সকল জন্তুই—সচেতন, অচেতন, ভুঁইফোড়—সকল প্রকার অপদার্থই সমান। আমাদের ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদ-মর্য্যাদা নাই। লোকে আমাদের সিংহ রাজাকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুরাজ কহে। কিন্তু ইহা কারণ-সঙ্গত নহে। উপস্থিত

সকল পশু অপেক্ষা আমাদের সিংহের বিক্রম ও সাহস অধিক। এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে মাত্র; নচেৎ সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোন মতে উত্তম নহে।

*   *   *   *   *

নব বোধোদয়ের এই প্রথম প্রবন্ধের শেষ ভাগ বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ের সহিত প্রায় একভাষী হইল। ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। বিদ্যাসাগরের উপর কলমডালা সহজ কথা কি?

৩০ কার্ত্তিক, ১২৮৭]   [সাধারণী—১৫ ভাগ, ৪ সংখ্যা

সমাপ্ত

CALCUTTA ORIENTAL SERIES

1. **Yuktikalpataru** ... Price Rs 2- 8-0
2. **Chanakya Rajniti Sastram** Re. 0-14-0
3. **Harilila** ... Re. 1- 4-0
4. **Inter-State Relations in Ancient India,** Pt. I by Dr. Narendranath Law, M.A., B.L., Ph. D. Rs 2- 0-0
5. **Muktaphalam** (in 2 parts) ... Rs 6- 0-0
6. **Chanakya-Katha** ... Re. 1- 0-0
7. **Historical Gleanings** ... Rs 5- 0-0
   by Bimalacharan Law, M.A., B.L.

Works by Dr. Narendranath Law, M.A., B.L., Ph. D.

1. **Studies in Ancient Hindu Polity,** vol. I Rs 2-10-0
2. **Promotion of Learning in India** Rs 3-6.
   (By Early European Settlers)
3. **Promotion of Learning in India** ... 14s.
   (During Muhammadan Rule)
4. **Aspects of Ancient Indian Polity** 10s. 6d
5. **Inter-State Relations in Ancient India,** Pt. I. ... Rs 2-0